শ্রী বিনয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস, ঢাকা

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৫
মূল্য –১।০

শিল্পী
শ্রীঅখিল গঙ্গোপাধ্যায়
পূর্ব্বাশা ষ্টুডিও
৪সি, ক্লাইস্ লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিউ আর্য্যমিশন প্রেস
১১নং রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

কাদম্বরী বাণভট্টের লেখা একখানি সংস্কৃত উপন্যাস। বাণভট্ট ছিলেন কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই কাদম্বরীও সেই সময়কার লেখা। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর স্থান অতি উচ্চে। কাদম্বরীর মূল আখ্যান-ভাগ লইয়া পণ্ডিত তারাশঙ্কর কবিরত্ন মহাশয় বাংলায় কাদম্বরী রচনা করেন। কবিরত্ন মহাশয়ের রচিত কাদম্বরী একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু তাঁহার ভাষা এখন বেশ শক্ত বলিয়া মনে হইবে।

কাদম্বরীর এই সংস্করণ বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধানতঃ কবিরত্ন মহাশয়ের কাদম্বরী অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভাষা আগাগোড়া যতদূর সম্ভব সরল করিতে যত্ন করা হইয়াছে। কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে মূল গ্রন্থখানির রস গ্রহণ করিতে যতখানি প্রয়োজন ততখানি অংশ এই সংস্করণে রাখা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের আখ্যান-ভাগ বর্ত্তমান বাংলার কিশোর-কিশোরীদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।

গল্পের পুরুষ ও স্ত্রী

পুরুষ

তারাপীড়—উজ্জয়িনীর রাজা

চন্দ্রাপীড়—তারাপীড়ের পুত্র, শাপগ্রস্ত চন্দ্র, জন্মান্তরে বিদিশার রাজা শূদ্রক

শুকনাস—উজ্জয়িনীর মন্ত্রী

বৈশম্পায়ন—শুকনাসের পুত্র, চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু শাপগ্রস্ত পুণ্ডরীক, জন্মান্তরে শুকপক্ষী

চিত্ররথ—গন্ধর্ব্বদের রাজা

হংস—গন্ধর্ব্বদের অপর রাজা, চিত্ররথের সম্পর্কিত ভাই

শ্বেতকেতু—মহর্ষি, পুণ্ডরীকের পিতা

পুণ্ডরীক—শ্বেতকেতুর পুত্র, শাপগ্রস্ত বৈশম্পায়ন ও শুকপক্ষী

কপিঞ্জল—পুণ্ডরীকের বন্ধু, শাপগ্রস্ত ইন্দ্রায়ুধ নামে চন্দ্রাপীড়ের অশ্ব

শূদ্রক—বিদিশা নগরীর রাজা, শাপগ্রস্ত চন্দ্রাপীড়

জাবালি—মহর্ষি, শুকের কাহিনী ইনি বর্ণনা করেন

হারীত—জাবালির পুত্র

কৈলাস, কেয়ূরক, মেঘনাদ প্রভৃতি পরিচারকগণ, ব্যাধ

স্ত্রী

বিলাসবতী—তারাপীড়ের মহিষী

মনোরমা—শুকনাশের পত্নী

মদিরা—চিত্ররথের মহিষী

কাদম্বরী—চিত্ররথের কন্যা

গৌরী—হংসের মহিষী

মহাশ্বেতা—হংসের কন্যা

পত্রলেখা—চন্দ্রাপীড়ের পরিচারিকা

চণ্ডাল-কন্যা—মানুষের রূপ-ধারিণী পুণ্ডরীকের মা লক্ষ্মীদেবী

তমালিকা, তরলিকা, মদলেখা প্রভৃতি পরিচারিকা ও সখীগণ

কাদম্বরী

অনেক কাল পূর্ব্বের কথা। শূদ্রক নামে এক রাজা বিদিশা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই নগরীটি ছিল বেত্রবতী নদীর তীরে। শূদ্রক খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বাহুবলে অনেক দেশ জয় করিয়া তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

একদিন সকালবেলা রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন। দৌবারিক আসিয়া জোড়হাতে নিবেদন করিল: মহারাজ, দক্ষিণ দেশ হইতে এক চণ্ডালের মেয়ে এক শুকপক্ষী লইয়া আসিয়াছে। পাখীটিকে সে মহারাজের চরণে উপহার দিতে চায়। আদেশের অপেক্ষায় রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

রাজা আদেশ করিলে দৌবারিক চণ্ডাল-কন্যাকে রাজ-সভায় লইয়া আসিল। চণ্ডালের মেয়ে রাজসভায় আসিয়া একেবারে হতবাক্! দেখিল, উপরে সোনার কাজ-করা এক প্রকাণ্ড চাঁদোয়া, চারিদিকে তার মণিমুক্তার ঝালর। বহুমূল্য বেশভূষায় সাজিয়া নানা দেশের রাজারা বসিয়াছেন। রাজার এক পাশে সোনার আসনে রাজার আত্মীয়েরা, অন্য পাশে মন্ত্রীরা বসিয়া রহিয়াছেন। রাজা এক মণিময় সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন।

চণ্ডাল-কন্যা সভায় প্রবেশ করিতেই সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। মেয়েটির আগে একজন বৃদ্ধ এবং পিছনে সোনার খাঁচা হাতে লইয়া একটি ছেলে আসিতেছিল। মেয়েটির রূপ-লাবণ্য দেখিয়া সভার সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। চণ্ডালের ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে, এ যেন তাহাদের বিশ্বাসই হইতেছিল না।

চণ্ডাল-কন্যা ও তাহার সঙ্গীরা রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিলে বৃদ্ধটি হাত জোড় করিয়া বলিল: মহারাজ, এই শুকপাখীটি ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এ সকল শাস্ত্র জানে, রাজনীতি জানে, ভাল বক্তৃতা করিতে পারে। এমন কি, যে সকল বিদ্যা মানুষেও জানে না, সে-সকল বিদ্যাও ইহার কণ্ঠস্থ। এই পাখীটির নাম বৈশম্পায়ন। আপনি 'পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা, জ্ঞানে

গুণেও সকলের চেয়ে বড়। তাই আমাদের প্রভুকন্যা পাখীটিকে আপনার চরণে সমর্পণ করিতে চাহেন। আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে ইনি কৃতার্থ হইবেন।

বৃদ্ধের কথা শেষ হইতেই খাঁচার ভিতরের শুকপাখীটি ডান পা উঠাইয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। ব্যাপার দেখিয়া রাজা ও সভাসদ্‌গণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নানা আলোচনার পর সভাভঙ্গের সময় হইল। রাজা একজন পরিচারিকাকে চণ্ডাল-কন্যা ও তাহার সঙ্গীদের বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে নিয়া স্নানাহার করাইবার ভার অপর এক পরিচারিকার উপর দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গের পর রাজা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। স্নান, পূজা ও আহারাদির পর রাজা বিশ্রাম কক্ষে গিয়া বৈশম্পায়নকে আনিতে আদেশ দিলেন। এক দাসী বৈশম্পায়নকে লইয়া আসিল। রাজা শুকপাখীকে বলিলেন: পাখী হইয়াও তুমি কিরূপে মানুষের মতই গুণবান্ হইয়াছ, সে-কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। তোমার জীবনের কথা আমাকে বলিলে খুব খুশী হইব।

রাজার আগ্রহ দেখিয়া বৈশম্পায়ন বলিল: মহারাজ,

এ সামান্য পাখীর জীবন-কাহিনী শুনিতে যখন আপনার এত আগ্রহ হইয়াছে, তখন সমস্ত কথাই বলিতেছি :

ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্ব্বত। তাহারই কাছে এক প্রকাণ্ড বন, নাম বিন্ধ্যাটবী। এই বিন্ধ্যাটবীতেই রাবণের অনুচর মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধরিয়া সীতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, শ্রীরামচন্দ্রও ইহার মায়ায় ভুলিয়া ইহাকে ধরিবার জন্য পিছনে ছুটিয়াছিলেন। সেই সুযোগে রাবণ রাজা এখান হইতেই সীতাকে হরণ করিয়া নিয়াছিল।

শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম যেখানটায় ছিল, তারই কাছে পম্পা নামে এক সরোবর আছে। পম্পার পশ্চিম তীরে আছে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। ঐ গাছটার গোড়া বেড়িয়া মস্তবড় একটা অজগর সাপ থাকিত। চারিদিকের অসংখ্য পাখী ঐ গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া বাস করিত।

সেই শিমুল গাছের এক কোটরের মধ্যে আমার বাবা ও মা থাকিতেন। আমাকে প্রসব করিয়াই আমার মা মারা যান। আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি একটু সময়ের জন্যও দূরে যাইতেন না। অন্যান্য পাখীরা খাইয়া গেলে যে সামান্য খাদ্য তাহাদের ঠোঁট হইতে গাছের তলায় পড়িত, তাহাই তিনি কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। আমি

খাইলে সামান্য যা বাকি থাকিত, সেটুকুই মাত্র নিজে খাইতেন।

এইভাবে দিন যায়। একদিন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, গাছের সমস্ত পাখী কলরব করিয়া খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইল। পাখীর ছানাগুলি যে যাহার বাসায় রহিয়াছে, আমি বাবার কাছে বসিয়া আছি, হঠাৎ শিকারীদের কোলাহল শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিংহ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি ভীষণ গর্জ্জনে বিরাট বন কাঁপাইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি ভয়ে বাবার পাখার নীচে লুকাইয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পর গোলমাল থামিল, বিশাল বন নিস্তব্ধ হইল। আমি আস্তে আস্তে বাবার পাখার নীচ হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, আমাদের গাছটার নীচেই কয়েকজন শিকারী বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। তাহারাও কিছুক্ষণ পরেই চলিয়া গেল।

একজন বৃদ্ধ শিকারীর কাছে পশুপক্ষী কিছুই দেখিলাম না, বোধ হয় লোকটা সেদিন কোন-কিছুই শিকার করিতে পারে নাই। সে কিন্তু অন্যান্য শিকারীর সঙ্গে গেল না, গাছের নীচে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সকলে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে শিকারী আমাদের গাছটা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত একবার ভালমত দেখিয়া

লইল। শেষে সে তরতর্ করিয়া গাছে উঠিল, এবং বাসা হইতে পাখীর ছানাগুলিকে মারিয়া নীচে ফেলিতে লাগিল। বাবা একে বৃদ্ধ, তাহাতে হঠাৎ এই রকম বিপদ দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কোনমতে আমাকে পাখায় জড়াইয়া বুকের নীচে লুকাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ঐ হতভাগাটা আমাদের কোটরে হাত দিল। বাবা সাধ্যমত আঁচড়-কামড় দিয়া তাহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। শিকারীটা বাবাকে টানিয়া বাহির করিল, তারপর অশেষ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিল। বাবার পাখার নীচে ছিলাম বলিয়া পাপিষ্ঠ আমাকে দেখিতে পাইল না। অন্যান্যের মত বাবার দেহটাও সে গাছের নীচে ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও নীচে পড়িলাম। যেখানটায় পড়িলাম, সেখানে কতকগুলি শুক্না পাতা জড় হইয়াছিল, আমি খুব বেশি আঘাত পাইলাম না।

বয়স বেশি না হইলে কাহারও মনে স্নেহ-ভালবাসা জন্মে না, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার হয় জন্মের সময় হইতেই। ভয়ে প্রাণ আমার উড়িয়া গিয়াছিল, তাই মৃত পিতাকে ছাড়িয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

তখনও আমার পাখা গজায় নাই, ভাল হাঁটিতেও

হাঁটিতেও শিখি নাই, তবু প্রাণের ভয়ে ছুটিলাম। কতবার পড়িলাম, কতবার উঠিলাম, আবার চলিতে লাগিলাম। শেষে এক তমাল গাছের গোড়ায় একটা গর্ত্ত দেখিয়া সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। এর মধ্যে ঐ ব্যাধটা গাছ হইতে, নামিল মরা পাখীগুলিকে লতায় বাধিয়া পিঠে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

একে অত উঁচু হইতে পড়িয়াছি, তাহার উপর প্রাণের ভয়। আমার শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। দারুণ পিপাসায় গলাবুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু যত দুঃখই আসুক, জীবনের আশা কেহ ছাড়িতে পারে না। আমিও পারিলাম না। কিন্তু এখন যতই ভাবি ততই মনে হয়, আমার মত হতভাগা আর কে আছে? মা আমাকে প্রসব করিয়াই মারা গেলেন। শোকে জর্জরিত বৃদ্ধ পিতা কত কষ্টে আমাকে লালন-পালন করিলেন, আমাকে রক্ষা করিতে গিয়াই তিনি প্রাণ হারাইলেন, একা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন, শুধু আমার জন্যই পারেন নাই; অথচ আমি এমনই অধম যে বাবার কথা একবারও না ভাবিয়া নিজে বাঁচিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মত এত বড় পাষণ্ড আর কে আছে!

মহারাজ! তখনকার কথা ভাবিলে সত্যই আমার বড় লজ্জা হয়, জীবনে বড় ধিক্কার আসে।

যাক্, যে-কথা বলিতেছিলাম। দারুণ পিপাসায় আমি কাতর হইয়া পড়িলাম। সরোবর দূরে রহিয়াছে, কিরূপে সেখানে যাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বেলা তখন দুপুর হইয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রে পথচলা আমার পক্ষে অসম্ভব হইল, তবু প্রাণের আশায় যাইতে লাগিলাম, কিন্তু একটু গিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলাম।

এই সময় সেই পথ দিয়া মহর্ষি জাবালির পুত্র হারীত বন্ধুর সঙ্গে সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। আমাকে রাস্তার পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি সঙ্গীকে বলিলেন: ঐ দেখ একটি শুকের ছানা, বোধ হয় উঁচু গাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বারবার হাঁ করিয়া জলপান করিতে চাহিতেছে। চল, ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই।

হারীত আমাকে কোলে তুলিয়া সরোবরে লইয়া গেলেন, ফোঁটা ফোঁটা জল আমার মুখে দিলেন। আমি প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম। আমাকে ছায়ায় বসাইয়া রাখিয়া তাঁহারা স্নান করিলেন। তারপর আমাকে আবার কোলে লইয়া আশ্রমে আসিলেন।

তপোবন দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। গাছে গাছে ফল, লতায় লতায় ফুল, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুন্‌গুন্ গান। এলাচ ও লবঙ্গলতার ফুলের মধুর গন্ধ

তপোবনটিকে যেন নন্দন বন করিয়া তুলিয়াছে। এখানে-

ওখানে যাগ-যজ্ঞ হইতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ মধুর স্বরে বেদপাঠ, কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন।

এক অশোক গাছের নীচে অতি বৃদ্ধ মহর্ষি জাবালি বেতের আসনে বসিয়া আছেন। অন্যান্য মুনিরা তাঁহার চারিদিকে বসিয়া শাস্ত্রকথা শুনিতেছেন। হারীত আমাকে কোলে নিয়াই পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন: স্নানের পথে আমি এই শুক-শাবকটিকে কুড়াইয়া পাইয়াছি; বোধ হয় গাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল।

পুত্রের কথায় মহর্ষি জাবালি আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমি পবিত্র হইয়া গেলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই বলিলেন: এই পক্ষী নিজের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেছে।

মহর্ষির কথায় সকলেই অবাক হইলেন। একটা ছোট পাখী কি এমন দুষ্কর্ম করিতে পারে, যাহার ফলে সে কষ্ট ভুগিতেছে! তাঁহারা মহর্ষিকে পাখীটির কাহিনী বলিতে অনুরোধ করিলেন।

মহর্ষি বলিলেন: সে অতি দীর্ঘ কাহিনী। বেলা গিয়াছে, এখন থাক্। রাত্রিতে আহারাদির পর বলিব।

রাত্রিতে আহারাদি শেষ হইলে তপোবনের সকলে আসিয়া মহর্ষি জাবালির নিকট বসিলেন। মহর্ষি তখন তাঁহাদের কাছে আমার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক

অবন্তী দেশে শিপ্রা নদীর তীরে উজ্জয়িনী নগরী। তারাপীড় নামে এক রাজা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী রাণী বিলাসবতী। শুকনাস ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। শুকনাসের স্ত্রী মনোরমা।

শুকনাসের বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, রাজনীতি-জ্ঞান ছিল অসীম। যে কোনরূপ জটিল সমস্যার মধ্যে পড়িলেও তিনি বিচলিত হইতেন না। সুতরাং মহারাজ তারাপীড় অনেক সময় মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়া আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতেন।

এত সুখ ও আনন্দের মধ্যে রাজার বড় দুঃখ। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। একথা মনে হইলেই তাঁহার রাজ্যধন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইত, জীবনে তিক্ততা আসিত।

একদিন রাজা অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রাণী মেঝের উপর বসিয়া অঝোরে কাঁদিতেছেন। তাঁহার চুল আলু-থালু,

অলঙ্কারগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়ান। তাঁহাকে ঘিরিয়া সখীরা নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্তঃপুরের বৃদ্ধারা রাণীকে নানাভাবে

প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাজা রাণীর কাছে বসিলেন, মধুর বাক্যে কান্নার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কোন উত্তর দিলেন না। রাজার মিষ্ট কথায় তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণ বাড়িল, চক্ষের জল বাধা মানিল না। রাজা অনেক চেষ্টায়ও রাণীকে শান্ত করিতে পারিলেন না।

রাণীর এক সখী রাজাকে বলিল: মহারাজ, আজ চতুর্দ্দশী। রাণী গিয়াছিলেন মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিতে। সেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল। তাহাতে শুনিলেন, নিঃসন্তান পিতামাতার ইহলোকেও সুখ নাই, পরলোকেও মুক্তি নাই। পুত্র না জন্মিলে পুং-নামক নরকে যাইতে হয়। ইহা শুনিয়াই রাণী যেন বড় আনমনা হইয়া উঠিলেন। অন্তঃপুরে আসিয়া সেই যে এখানে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন, এখনও তার বিরাম নাই। আমরা সকলে কত বুঝাইলাম কিন্তু তিনি নাওয়া-খাওয়া কিছুই করিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

শুনিয়া রাজারও বড় দুঃখ হইল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: শোনো রাণী, যাহা ভগবানের হাতে তাহার জন্য দুঃখ বা শোক করা অন্যায়। একমাত্র তিনিই মানুষের সকল কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। তাঁহার কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা কর।

রাজার আদরে ও স্নেহপূর্ণ কথায় বিলাসবতী কিছুটা শান্ত হইলেন। সেদিন হইতে তাঁহার প্রধান

কার্য্য হইল একমনে দেবতার আরাধনা, অতিথি-ব্রাহ্মণের সেবা, গুরুজনের পরিচর্য্যা। যে যেমন ব্রত-নিয়ম করিতে বলে, অতি কষ্টকর হইলেও তাহাই করেন; গণক দেখিলেই গণাইতে বসেন; রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিলে বৃদ্ধাদেব তাহাব ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন।

দিন যায়। একদিন শেষরাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, বিলাসবতী এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপর তলে শুইয়া আছেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মুখে প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্ন দেখিয়াই তিনি জাগিয়া উঠিলেন, আব ঘুমাইলেন না।

সকালে শয্যাত্যাগ কবিয়া রাজা শুকনাসকে ডাকাইয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। শুকনাস বলিলেনঃ মহারাজ, এতদিনে বোধ হয় আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। মনে হইতেছে, আমরা খুব শীঘ্রই রাজকুমারের মুখ দেখিব। আমিও শেষরাত্রে এক মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেবতার মত এক সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ যেন মনোরমার কোলে একটি ফুটন্ত পদ্মফুল ছুড়িয়া দিলেন। শেষরাত্রির স্বপ্ন প্রায়ই বিফল হয় না, মহারাজ।

রাজা মন্ত্রীকে লইয়া মহিষীব নিকট গেলেন। তুইজনে নিজ নিজ স্বপ্নের কথা রাণীকে বলিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাণী সত্য-সত্যই গর্ভবতী হইলেন।

রাজবাড়িতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। ঠিক একই সময়ে মনোরমারও গর্ভসঞ্চার হইল।

তারপর এক শুভদিনে বিলাসবতীর একটি পুত্র জন্মিল। এই সংবাদে নগরবাসীদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাজবাড়িতে উৎসবের ঘটা; ঘরে ঘরে নাচ গান; রাজ্যময় সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা দীন-দুঃখী অনাথ-আতুরকে দুই হাতে দান করিতে লাগিলেন। আশার অতিরিক্ত দান পাইয়া তাহারা প্রাণ ভরিয়া রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কারাগারের কয়েদীরা মুক্তি পাইয়া রাজকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিল।

রাজা পুত্রের মুখ দেখিবেন, গণকেরা শুভলগ্ন স্থির করিয়া দিল। রাজা মন্ত্রীর সহিত জল ও আগুন ছুঁইয়া আঁতুড়-ঘরে শিশুর মুখ দেখিলেন। ঘরের চারিদিকে তখন নানারূপ মঙ্গলকার্য্য হইতেছিল। রাজা পুত্রমুখ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হুলুধ্বনি হইল, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শিশুর মুখ দেখিয়া রাজা ও মন্ত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না। শুকনাস শিশুর শরীরে নানারকম রাজচিহ্ন রাজাকে দেখাইলেন।

এই সময়ে মন্ত্রীর বাড়ি হইতে সংবাদ আসিল, মনোরমারও একটি ছেলে হইয়াছে। রাজা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন: "আজ কি শুভদিন! বিপদের সঙ্গে বিপদ আর সম্পদের

সঙ্গে সম্পদ আসে, এই যে একটা চলতি কথা আছে তা মিথ্যা নয়। চল, এখন তোমার বাড়িতে আনন্দোৎসব করিতে যাই। রাজা ও শুকনাস মনোরমার ছেলে দেখিতে চলিয়া গেলেন।

দশম দিনে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের নামকরণ উৎসব হইল। রাজা স্বপ্নে পূর্ণচন্দ্রকে রাণীর মুখে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, রাজপুত্রের নাম হইল চন্দ্রাপীড়। শুকনাস রাজার সম্মতি লইয়া পুত্রের নাম রাখিলেন বৈশম্পায়ন।

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের শিক্ষার বয়স হইল। রাজা রাজধানীর পাশে শিপ্রা নদীর তীরে এক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইলেন। উহার এক পাশে অশ্বশালা, অপর পাশে ব্যায়ামশালা তৈরী হইল। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ তারাপীড় শুভদিন দেখিয়া চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন।

সুশিক্ষার গুণে অল্প দিনেই রাজপুত্র সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। রীতিমত ব্যায়াম করিয়া তাঁহার শরীর সুগঠিত হইয়া উঠিল। যে মুগুর দশজন বলবান লোকে তুলিতে পারিত না, তাহা তিনি অনায়াসে একহাতে তুলিতেন। অস্ত্র-বিদ্যায়ও তাঁহার খুব দক্ষতা জন্মিল। বৈশম্পায়ন ব্যায়াম

ও অস্ত্রবিদ্যা তত শিখিলেন না, কিন্তু অন্যান্য সকল বিদ্যায় শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন এক-বয়সী, একসঙ্গে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত। দুই জনের মধ্যে ভালবাসা ছিল গভীর। একজনকে ছাড়িয়া অপর জন এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না।

শিক্ষা শেষ হইলে দুইজনেই গৃহে যাইবার অনুমতি পাইলেন। উহাদের আনিবার জন্য মহারাজ তারাপীড় বহু হাতীঘোড়া ও সৈন্য-সামন্ত দিয়া সেনাপতি বলাহককে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

বলাহক রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রজারা ও পরিজনেরা আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। আপনার জন্য মহারাজ ইন্দ্রায়ুধ নামে একটি ঘোড়া পাঠাইয়াছেন। পারস্য দেশের রাজা ঘোড়াটি মহারাজকে উপহার দিয়াছেন। এমন আশ্চর্য্য ঘোড়া আমরা জীবনেও দেখি নাই। বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনার অনুমতি পাইলেই আনিব। অনেক সামন্ত রাজাও আপনাকে দেখিবার আশায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।

চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধকে ভিতরে আনিতে বলিলেন। অমন সুন্দর ও তেজী ঘোড়া দেখিয়া রাজপুত্র খুব খুশী হইলেন। তিনি ইন্দ্রায়ুধে ও বৈশম্পায়ন অপর একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরের সামন্ত রাজারা রাজকুমারকে দেখিয়াই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বলাহক তাঁহাদের প্রত্যেককে রাজকুমারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। রাজকুমারও প্রত্যেককে মধুর কথায় তুষ্ট করিলেন।

বন্দীরা সুস্বরে রাজকুমারের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। ভৃত্যেরা রাজপুত্রের মাথায় বহুমূল্য ছাতা ধরিল, পরিচারিকারা চামর দিয়া বাতাস করিতে করিতে চলিল।

রাজকুমারকে দেখিবার জন্য রাজপথের দুইধারে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। প্রতি গৃহের বারান্দায় ছাদে জানালায় নগরের স্ত্রীলোকেরা নূতন বেশভূষায় সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই বিশাল জনসমুদ্র জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়া রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

রাজবাড়ির সিংহদরজায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রাপীড় সামন্ত রাজাদের কাছে বিদায় লইলেন। রাজবাড়ির প্রশস্ত আঙ্গিনায় আসিয়া রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র ঘোড়া হইতে নামিলেন, দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইলেন। বলাহক আগে আগে চলিল। শত শত সশস্ত্র সৈন্য ও দ্বারপাল তাঁহাদিগকে সামরিক অভিবাদন করিল।

প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া তাঁহারা অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে অগুনতি তীর ধনু তরবারি প্রভৃতি ঘরে ঘরে সাজান

রহিয়াছে। সেখান হইতে তাঁহারা পশুশালায় গিয়া দেখিলেন, অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী নূতন আনা হইয়াছে। সেগুলি মস্ত মস্ত লোহার খাঁচার এদিকে-সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছে। পশুশালা হইতে তাঁহারা অশ্বশালা, পক্ষিশালা, সঙ্গীতশালা ও চিত্রশালা ঘুরিয়া বিচার-সভায় গেলেন। সেখানে বিচারপতিরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন।

এইরূপে বিশাল রাজবাড়ির ছয়টি মহল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মহারাজ তারাপীড়ের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করিল।

চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নকে লইয়া রাজার নিকটে গেলেন, রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা পরম আদরে দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও বিনীত ভাবে রাজার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

পিতার নিকটে বিদায় লইয়া তাঁহারা গেলেন রাণীর কাছে। রাণী বিলাসবতী ছেলে ও ছেলের বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন, কত কথাই বলিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড় ছোট ছেলেটির মত মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মা বলিলেন: তোদের

লেখাপড়া তো শেষ হইল, এখন সুন্দরী বউ ঘরে আসিলেই আমাদের মনের সাধ পূর্ণ হয়।

রাণীর কথায় দুইজনে লজ্জায় রাঙা হইয়া মাথা নোয়াইলেন।

অন্তঃপুরের সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজকুমার বৈশম্পায়নের সঙ্গে মন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন। রাজবাড়ির কাছেই মন্ত্রী শুকনাসের প্রকাণ্ড বাড়ি, রাজবাড়ির মতই সুসজ্জিত ও সুন্দর। শুকনাস তখন সামন্ত ও অধীন রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসিয়াছেন। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন আসিয়া মন্ত্রীকে প্রণাম করিলেন। শুকনাস প্রণত পুত্র ও রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, কুমার চন্দ্রাপীড়, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আশীর্ব্বাদ করি তুমি যুবরাজ হইয়া প্রজাদের মঙ্গল সাধন কর।

রাজকুমার সভার সকলকে অভিবাদন করিয়া অন্তঃপুরে মনোরমাকে প্রণাম করিলেন। মনোরমা সস্নেহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজকুমারের বাসের জন্য রাজবাড়ির সঙ্গেই শ্রীমণ্ডপ নামে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজকুমার মন্ত্রীর বাড়ি হইতে ফিরিয়া স্নানাহার করিলেন, বিশ্রামের জন্য গেলেন শ্রীমণ্ডপে।

নানা আমোদ-প্রমোদ ও কথাবার্ত্তায় সেদিন কাটিয়া

গেল। রাজার অনুমতি লইয়া পরদিন প্রভাতে রাজকুমার শিকার করিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে গেল অনেকগুলি শিকারী কুকুর, কয়েকটা শিক্ষিত হাতী, কতকগুলি তেজী ঘোড়া আর বহু দক্ষ শিকারী। রাজকুমার অনুচরদের সহিত গভীর বনে গিয়া বহু পশু শিকার করিলেন। বেলাশেষে তিনি রাজভবনে ফিরিয়া আসিলেন। শিকারের আনন্দে সেদিনও কাটিয়া গেল।

কৈলাস রাজ-অন্তঃপুরের এক বৃদ্ধ অনুচর। পরের দিন সকাল বেলা স্বর্ণালঙ্কার-পরা এক পরমা সুন্দরী কুমারীকে লইয়া সে শ্রীমণ্ডপে আসিল। দুই জনেই বিনীত ভাবে রাজকুমারকে অভিবাদন করিল। কৈলাস কহিলঃ রাণী-মা আদেশ করিলেন, এই মেয়েটিকে আপনার সেবার জন্য নিযুক্ত করুন। ইনি কুলুত দেশের রাজার কন্যা, পত্রলেখা। কুলুত দেশের রাজধানী জয় করিয়া মহারাজ এই মেয়েটিকে বন্দী করিয়া আনেন। রাণী-মা ইহাকে নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করিয়াছেন। রাণী-মা বলিয়া দিলেন, ইহাকে সাধারণ পরিচারিকার মত মনে করিবেন না, সখী ও শিষ্যার মত বিশ্বাস করিবেন, রাজকন্যার মত সম্মান দেখাইবেন। এ সত্যই বড় ভাল মেয়ে, এর গুণে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন।

মায়ের আদেশের কথা শুনিয়া কুমার পত্রলেখার দিকে

চাহিলেন, আকৃতি দেখিয়াই বুঝিলেন, পত্রলেখা সত্যই সাধারণ মেয়ে নয়। চন্দ্রাপীড় কৈলাসকে বলিয়া দিলেন : মাকে গিয়া বলিও, তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম।

কৈলাস তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে পত্রলেখা ছায়ার মত রাজকুমারের সঙ্গে থাকেন, মনে প্রাণে তাহার সেবা করেন। পত্রলেখার ব্যবহারে কুমার সত্য সত্যই মুগ্ধ হন।

কিছুদিন পর মহারাজ তারাপীড় ঘোষণা করেন, কুমার চন্দ্রাপীড় যুবরাজ হইবেন। এই সংবাদে রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

একদিন রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কোন কাজের জন্য শুকনাসের বাড়িতে গিয়াছেন। কাজ শেষ হইলে শুকনাস বলিলেন : রাজকুমার, শীঘ্রই এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-পালনের ভার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলিতেছি, আশা করি তুমি কথাগুলি মনে রাখিবে। তুমি সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছ, সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছ। তোমার অজানা কিছু নাই, তোমাকে উপদেশ দিবারও কিছু নাই ; তবু তোমাকে কতকগুলি সত্য কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তুমি যুবক। মহারাজ তোমাকে যুবরাজ করিতেছেন,

একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের উপর তুমি প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইবে, তুমি বিপুল ধন-সম্পত্তিরও অধিকারী হইবে। সুতরাং যৌবন, ধন-সম্পদ্ ও প্রভুত্ব—এই তিনটাই তুমি লাভ করিলে। কিন্তু, এই বয়সে মানুষের ব্যবহার প্রায়ই বন্য জন্তুর মত হইয়া পড়ে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কার্য্যকেও তুকর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। ধন থাকিলেই লোকের এক প্রকার মত্ততা আসে, ভালমন্দ হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ধনের সঙ্গে সঙ্গেই আসে অহঙ্কার। অহঙ্কারী লোকেরা মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করে না, নিজেকেই সকলের চেয়ে গুণবান্, বিদ্বান ও প্রধান বলিয়া মনে করে, অন্যের কাছেও সেরূপ ভাবই প্রকাশ করে। মানুষের মনে 'আমিই প্রভু' এই ভাব প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই বিষের প্রতিষেধক ঔষধ আছে, কিন্তু ইহার আর কোন ঔষধও নাই। প্রভুরা অধীন লোকদের মনে করে দাসের মত, নিজেরা সুখে থাকিয়া পরের তুঃখ তাহারা বুঝিতেই পারে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে মানুষ সৎ ও বিনীত হয়, এমন কথা বলা চলে না। উর্ব্বরা জমিতেও কাঁটাগাছ জন্মে, চন্দন-কাঠে ঘষা লাগিয়া যে আগুন বাহির হয়, সে আগুনেও সমস্ত পুড়িয়া ছারখার হইতে পারে। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র, মূর্খকে উপদেশ দিলে

কোন ফল হয় না। ধনীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক খুব কম। পারিষদেরা তাহার কথায়ই সায় দেয়, প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না। যদি কোন সাহসী পারিষদ ভয় না করিয়া প্রভুর কথা অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, প্রভু সে-কথা শোনেই না, আর শুনিলেও তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

লক্ষ্মীর স্বভাব একবার ভাবিয়া দেখ। কত কষ্ট করিয়া একে লাভ করিতে হয়, কত যত্নে রক্ষা করিতে হয়, তবু কখনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না, রূপ গুণ কুল শীল কিছুই বিবেচনা করে না। লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে কুকাজকে মনে করে সুকাজ। মিথ্যা তোষামোদ না করিতে পারিলে ধনীদের কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না। ধনীরা তোষামোদকারীকেই সত্যবাদী বলিয়া মনে করে, তার সঙ্গেই আলাপ করে, তাহাকেই সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবে, তার পরামর্শ মতই কাজ করে; আর যে স্পষ্ট কথা বলিয়া উপদেশ দেয় তাহাকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করে, কাছেও বসিতে দেয় না।

রাজারা নিজের চোখে কিছুই দেখিতে পান না, তাই কতকগুলি হতভাগা প্রতারক তাঁহাদিগকে ঠকাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিবার সুযোগ খোঁজে। তুমি ধীর-স্থির, তবু তোমাকে বার বার বলিতেছি, ধন-যৌবনে উন্মত্ত হইয়া

কর্ত্তব্য কাজ করিতে বিরত হইও না, চাটুকারের কথায় ভুলিও না। মহারাজের ইচ্ছায় যুবরাজ হইয়া তুমি সর্ব্বদা প্রজাগণের মঙ্গল সাধন কর।

চন্দ্রাপীড় গভীর মনোযোগের সহিত শুকনাসের উপদেশ শুনিলেন। তিনি মনে মনে সেই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে রাজবাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে রাজ্যব্যাপী বিরাট সমারোহের মধ্যে রাজকুমারের অভিষেক হইল। পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করিয়া রাজকুমারের সুন্দর রূপ অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল। অভিষেকের পর যুবরাজ উজ্জ্বল বসন-ভূষণ পরিয়া রাজসভায় রত্ন-সিংহাসনে বসিলেন। সামন্ত ও অধীন রাজারা সকলে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নজর দিলেন। রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে সপ্তাহকাল বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইল। দীন-দুঃখী, অনাথ-আতুর যে যেখানে ছিল, এই কয়দিন ভূরি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। সকলেই আশাতিরিক্ত দান পাইয়া প্রাণ খুলিয়া রাজকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যুবরাজ রাজ্যে সুশৃঙ্খল শাসন ও সুনিয়ম স্থাপন করিলেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। রাজপুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়া রাজাও নিশ্চিন্ত মনে দানধ্যান ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

দুই

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার জন্য এক প্রকাণ্ড হাতী নানারূপ সোনার অলঙ্কারে সাজানো হইল। তাহাতে রাজকুমার ও পত্রলেখা চলিলেন, পাশেই চলিলেন বৈশম্পায়ন আর একটি হাতীর উপর। সৈন্যদলের জয়ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। সূর্য্যের আলোয় তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝলমল করিতে লাগিল। হাতী ঘোড়ার ডাকে, রণবাদ্যের প্রচণ্ড শব্দে, সৈন্যদলের কলরবে মনে হইল যেন পৃথিবীতে
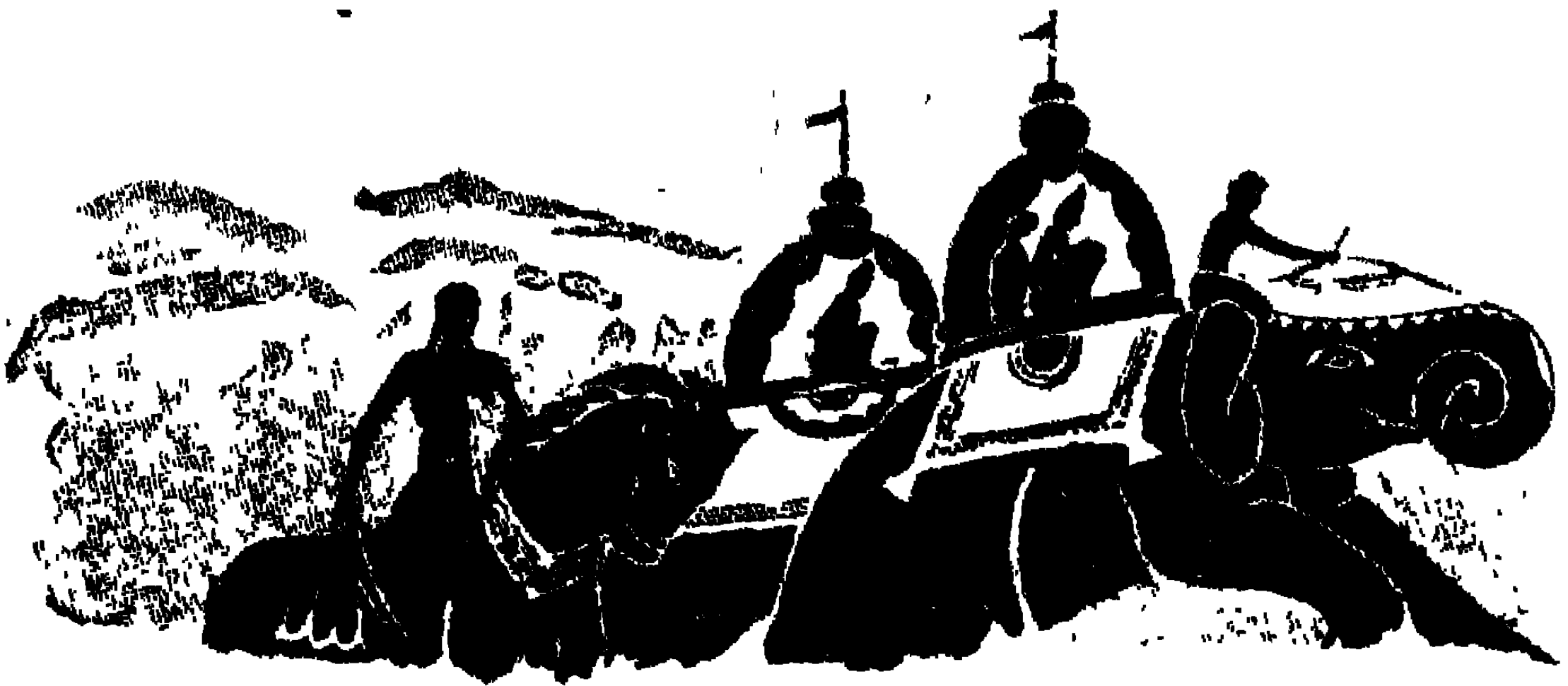
একটা প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। হাতী ঘোড়া ও সৈন্যদলের পায়ের ধূলায় সমস্ত আকাশ একেবারে ঢাকিয়া গেল।

কতক দূর গিয়া সন্ধ্যার সময়ে সৈন্যদল শিবির স্থাপন করিল; সকাল বেলা আবার তাহারা চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে বৈশম্পায়ন যুবরাজকে বলিলেন: কই এমন দেশ বা এমন দুর্গ তো দেখি না, যাহা মহারাজ জয় না করিয়াছেন। মহারাজের অসীম বীরত্বের চিহ্ন সকল দেশেই দেখিতেছি।

দুই একটি ছোট দেশ, যাহা তখনও জয় করিতে বাকি ছিল, যুবরাজ সেগুলিকে জয় করিলেন। অবশেষে কৈলাস পর্ব্বতের কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে সুবর্ণপুর নামক এক সুন্দর নগর তখনও জয় করা হয় নাই। এই সুবর্ণপুরে কিরাত জাতির হেমজট নামে এক শাখা বাস করিত। কিরাতরা ছিল সেকালের এক বন্য জাতি।

রাজকুমার ইহাদের সহজেই পরাজিত করিয়া সুবর্ণপুর দখল করিলেন।

এই দীর্ঘ দিগ্বিজয়ের অভিযানে তাঁহার সৈন্যেরা বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। তিনি সৈন্যদিগকে সুবর্ণপুরে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, নিজেও সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকুমার সুবর্ণপুরের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য বনে শিকার করিতে বাহির হইলেন। কিছু দূরে গিয়া দেখিলেন, এক কিন্নর ও কিন্নরী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্নররা ছিল দেবতাদের গায়ক; ইহারা না দেবতা, না মানুষ। যুবরাজ জীবনেও কিন্নর দেখেন নাই। সুতরাং কৌতুক ভরে তিনি তাহাদের দিকে ঘোড়া চালাইলেন, কিন্তু কিছুতেই উহাদের ধরিতে পারিলেন না। উহারা আঁকাবাঁকা পথে ছুটিয়া পাহাড়ের চূড়ায় কোথায় লুকাইয়া গেল।

রাজকুমার কিন্নর ধরিবার আশায় এতক্ষণ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছেন। এখন সেই জনমানবশূন্য গভীর বনে পথ হারাইয়া বিপাকে পড়িলেন। এদিকে বেলা দুই প্রহর গড়াইয়া যায়। কুমার পিপাসায় কাতর, জলাশয়ের আশায় বনপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকেন।

পথের দুই দিকে বড় বড় গাছ। চারিদিকে ডালপালা ছড়ান। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, তার মধ্যে উজ্জ্বল ও মসৃণ

বড় বড় পাথর। কেহ যেন বসিবার জন্য সেগুলি সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কতক দূর যাইতেই জলকণাবাহী সুশীতল বাতাসে রাজকুমারের শরীর জুড়াইয়া গেল। ভ্রমরের গুঞ্জনে ও কলহাসের কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া আর একটু যাইতেই তিনি অচ্ছোদ নামক এক প্রকাণ্ড সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সরোবরের স্বচ্ছ নির্ম্মল জলে জলপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। অসংখ্য ভ্রমর গুনগুন্ করিতে করিতে এক ফুল হইতে অপর ফুলে মধুপান করিতেছে। কলহাসগুলি সরোবরের মধ্যে খেলা করিতেছে।

সরোবরের দক্ষিণ তীরে গিয়া রাজকুমার ঘোড়া হইতে নামিলেন। জিন-বল্‌গা প্রভৃতি নামাইয়া ফেলিতেই ইন্দ্রায়ুধ মাটিতে কয়েকবার গড়াইয়া লইল, তারপর সরোবরে নামিয়া ইচ্ছামত স্নান ও জলপান করিয়া উঠিল। রাজকুমার পিছনের পা বাঁধিয়া দিলে ইন্দ্রায়ুধ মনের সুখে তীরের নূতন দূর্ব্বা খাইতে লাগিল। রাজকুমারও স্নান সারিয়া পদ্মের মৃণাল খাইলেন এবং জলপান করিয়া তীরে উঠিলেন। তারপর এক লতামণ্ডপের মধ্যে শিলার উপরে পদ্মপাতার বিছানা পাতিয়া উত্তরীয়খানা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ সরোবরের উত্তর তীর হইতে বীণার ঝঙ্কারের সহিত সুমধুর গানের সুর রাজকুমারের কানে ভাসিয়া আসিল।

ইন্দ্রায়ুধ ঘাসের কবল মুখে লইয়াই সেই শব্দের দিকে কান পাতিয়া রহিল। এই জনশূন্য বনে কোথায় এমন সুন্দর গান হইতেছে জানিবার জন্য রাজকুমার সেইদিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল গানের অস্ফুট সুর তাহার কানে আসিতে লাগিল।

রাজকুমার ইন্দ্রায়ুধের বাধন খুলিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখিলেন, কৈলাস পর্ব্বতের গায়েই আর একটি ছোট পর্ব্বত রহিয়াছে। চারিদিকে সুন্দর উপবন-ঘেরা পর্ব্বতটি বড়ই চমৎকার দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতটির নাম চন্দ্রপ্রভ। উহার নিচেই এক শিব-মন্দির। মন্দিরের ভিতর লক্ষ্য করিয়া রাজকুমার দেখিলেন, শিব-মূর্ত্তির নিকটে বসিয়া দেববালার মত একটি মেয়ে বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে মহাদেবের স্তবগান করিতেছেন। মেয়েটির বয়স প্রায় আঠারো বৎসর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ভস্মমাখা, কাঁধে জটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন পার্ব্বতী শিবের আরাধনায় মগ্ন হইয়াছেন। মেয়েটি সত্যই শিবের ব্রত পালন করিতেছিলেন।

রাজকুমার এক গাছের শাখায় ঘোড়া বাধিয়া সাষ্টাঙ্গে শিব মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। এরূপ নির্জ্জন স্থানে অপরূপ সুন্দরী মেয়েটিকে একাকী তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহার বড় কৌতূহল হইল। উহার নামধাম ও তপস্যার

কারণ জানিবার আশায় মন্দিরের এক পাশে বসিয়া রহিলেন।

গান শেষ হইল, বীণার ঝঙ্কারের রেশ থামিয়া গেল। মেয়েটি উঠিয়া ভক্তিভরে মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর প্রশান্ত দৃষ্টিতে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে বলিলেন মহাশয়, আশ্রমে চলুন, মহাদেবের অসীম কৃপায় আজ আমি অতিথি-সৎকার করিয়া কৃতার্থ হইব। রাজকুমার ভক্তিভাবে তাপসীকে প্রণাম করিয়া কৌতূহল ভরে শিষ্যের মত তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন।

কিছু দূরেই একটি গিরি গুহা। গুহার মুখ তমাল গাছে ঢাকা, সূর্য্য দেখা যায় না। পাশেই ঝরঝর্ করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে, তাহার মধুর শব্দে কান জুড়াইয়া যায়। গুহার ভিতরে একপাশে তাপসীর বাকল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষার পাত্র রহিয়াছে।

তাপসী অতিথি রাজকুমারকে মধুর বাক্যে মালাচন্দন প্রভৃতি দিয়া আপ্যায়িত করিলেন, এক শিলার উপর বসিতে দিলেন। কুমার বসিলে তাপসী অপর এক শিলায় বসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রাপীড় নিজের পরিচয় দিয়া কেমন করিয়া সেখানে আসিলেন, তাহা বলিলেন।

কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাপসী অতিথির

নিকট বিদায় লইয়া গুহা হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আসিলেন।

কুমার অবাক হইয়া দেখিলেন, তাপসী ফলন্ত গাছগুলির

নিচে গিয়া ভিক্ষাপাত্রটি তুলিয়া ধরিতেই উহা নানারকম পাকা ফলে ভরিয়া গেল।

তিনি অতিথির আহারের জন্য আসন পাতিয়া দিলেন, সেই সকল ফল কাটিয়া খাইতে দিলেন। চন্দ্রাপীড় খাইবেন কি, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন এমন আশ্চর্য ব্যাপার তো জীবনে কখনও দেখি নাই; স্বচক্ষে না দেখিলে হয়ত বিশ্বাসই করিতাম না যে, তপস্যার প্রভাবে অচেতন বস্তুও সচেতনের মত মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকে।

চন্দ্রাপীড়কে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাপসী বলিলেন আপনি রাজকুমার, এই খাদ্য আপনার উপযুক্ত নয় জানি। আশ্রমে ইহার বেশি আর কিছু আপনাকে দিতে পারিলাম না বলিয়া আমার লজ্জার অন্ত নাই।

তাপসীর কথায় কুমার বড় লজ্জা পাইলেন, বলিলেন আমি খাদ্যের কথা মোটেই ভাবিতেছি না আপনার তপস্যার অসীম প্রভাবে বিস্মিত হইয়া সেই কথাই ভাবিতেছি। রাজপ্রাসাদের নানারকম সুস্বাদু খাদ্যের চেয়েও এ খাদ্য আমাকে অনেক বেশি তৃপ্তি দিবে, ইহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন।

রাজকুমার পরম তৃপ্তির সহিত সেই সকল সরস ফল খাইলেন। অতিথির খাওয়া হইলে তাপসীও কিছু ফলমূল খাইলেন।

ইনি। দেববাজ ইন্দ্র ইহাব বন্ধু ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে গন্ধর্ব্বদের বাজা কবিয়া দেন। পুবাণে যে নয়টি বর্ষ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূভাগেব কথা আছে, তাহাদেব একটিব নাম কিম্পুরুষ। ইহা ভাবতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। এই কিম্পুরুষবর্ষে হেমকূট নামক পর্ব্বত ভূভাগে চিত্ররথ বাস কবেন। এখানে তাহাব অধীনে হাজাব হাজাব গন্ধর্ব্ব বহিয়াছে। তিনি এই মনোহব উপবন তৈযাব কবিয়া ইহাব নাম দিয়াছেন চৈত্ররথ। অচ্ছোদ নামে এ বস্তীর্ণ সরোবর তিনিই খনন কবাইয়াছেন এবং উপবনের মধ্যে এই সুন্দব মন্দিব ও শিবমূর্ত্তি স্থাপন কবিয়াছেন।

দক্ষ প্রজাপতিব অপর এক মেয়ে অরিষ্টা। অরিষ্টার ছেলে হংস। তিনিও একজন ভুবন-বিখ্যাত গন্ধর্ব্ব। গন্ধর্ব্ববাজ চিত্রবথ হংসকে খুব ভালবাসিতেন তিনি তাহাব বাজ্যের এক অংশ হংসকে দিয়া তাঁহাকে সেখানকাব বাজা করেন। হংসও থাকেন হেমকূটে। গন্ধর্ব্ববাজ হংসেব মহিষী এক পরমা সুন্দরী অপ্সরা, নাম গৌবী। এই হতভাগিনী হংস ও গৌরীব একমাত্র মেয়ে। আমাব নাম মহাশ্বেতা। বাপ-মার অন্য কোন সন্তান ছিল না বলিয়া আমাব আদবেব অন্ত ছিল না। ছেলেবেলাব সেই সুখেব কথা যখনই মনে হয়, তখনই আবাব সেই সোনাব শৈশবে ফিবিয়া যাইতে মন আকুল হইয়া উঠে কৈশোব বযস পর্য্যন্ত বাবা-মা

আত্মীয়-পরিজনের অফুরন্ত আদরে আমার দিন কাটিয়া গেল, আমি যৌবনে পদার্পণ করিলাম।

বসন্ত কাল। পদ্মবনে অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়াছে। আমের মুকুল দেখা দিয়াছে, মলয় বাতাসের ধীর প্রবাহে আনন্দিত হইয়া কোকিল আমের ডালে বসিয়া কুহুস্বরে প্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছে, অশোক ও পলাশ ফুলে গাছ ভরিয়া উঠিয়াছে, বকুলের কুঁড়ি সবে মাত্র ফুটিতে সুরু করিয়াছে, ভ্রমরগুলি গুন্ গুন শব্দ তুলিয়া ফুলে ফুলে মধু পান করিতেছে,—এমনি এক মধুর বসন্তে আমি মায়ের সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিলাম। সরোবরের চারিদিকে অপরূপ শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ফুলে ফলময় উপবন আমাকে যেন টানিতে লাগিল। আমি একাকিনী উপবনের শোভা দেখিয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ এক অপূর্ব্ব সুগন্ধে আমার দেহ ও মন যেন মাতাল হইয়া উঠিল। কোথায় কোন ফুলের এই প্রাণ-মাতানো গন্ধ জানিবার জন্য আমি এদিক-ওদিক খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর দূরে দেখিলাম, এক পরম সুন্দর মুনিকুমার সরোবরে স্নান করিতে আসিতেছেন। তাহার কানে ফুলের মঞ্জরী। অমন সুন্দর ফুল আমি জীবনেও দেখি নাই, তার গন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে,

বলিয়া তিনি কান হইতে মঞ্জরী লইয়া আমার কানে পরাইয়া দিলেন। তাঁহার জপের মালাটি আমার কাপড়ে পড়িয়া গেল, তিনি টেরও পাইলেন না। আমি তাঁহাকে লুকাইয়া মালাটি গলায় পরিলাম।

আমাদের এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, মা স্নান সারিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলাম। তাড়াতাড়িতে তাঁহাদের প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

দূর হইতে শুনিলাম, কপিঞ্জল পুণ্ডরীককে বলিতেছেন পুণ্ডরীক, তোমার কি জ্ঞান-চৈতন্য লোপ পাইয়াছে? তোমার জপের মালা কোথায়? মালাটি তোমার হাত হইতে পড়িয়া গেল, ঐ হতভাগা মেয়েটা তোমার চক্ষে ধূলি দিয়া মালা নিয়া পলাইল, তুমি টেরও পাইলে না! কি আশ্চর্য!

পুণ্ডরীক বন্ধুর কথায় হয়ত লজ্জা পাইলেন, রাগের ভাণ করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ দুষ্ট মেয়ে! তুমি আমার জপের মালা ফিরাইয়া দাও, নইলে তোমাকে যাইতে দিব না। তাঁহার ডাকে আমি থামিলাম। তিনি নিকটে আসিলে আমি লজ্জায় মুখ নত করিয়া ভুলে আমার মুক্তার একনরী হার তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিছুই খেয়াল করিলেন না। জপমালা ভাবিয়া আমার হারগাছা লইয়াই চলিয়া গেলেন।

আমি স্নান করিয়া মায়ের সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। সেদিন আমার যেন কি হইল, আমি মুহূর্তের জন্যও মুনিকুমারের কথা ভুলিতে পারিলাম না।

বেলা শেষ হইল। সন্ধ্যার একটু আগে সংবাদ পাইলাম, এক মুনিকুমার জপের মালা নিতে আসিয়াছেন। মন আমার আনন্দে নাচিয়া উঠিল আমি মুনিকুমারকে আমার নিকট আনিতে আদেশ দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই কপিঞ্জল আসিলেন। তাহার মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ। ভাবে বুঝিলাম, তিনি তরলিকাকে দেখিয়া আমাকে কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। আমি তাহার পা ধোয়াইয়া বসিতে আসন দিলাম; বলিলাম আমাকে যাহা বলিবেন, এর কাছে অনায়াসে বলিতে পারেন। এ আমার অতি বিশ্বস্ত সখী।

কপিঞ্জল বলিলেন রাজকুমারি, সে লজ্জার কথা কি আর বলিব, আমার কথা যেন সরিতেছে না। বনে যাঁর বাস, যাঁর আহার ফলমূল, সাজসজ্জা যাঁর জটা আর বাকল, সেই তপস্বী যদি তাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলিয়া কোন রাজার মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়, তবে তাঁকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব জানি না। বন্ধুকে লইয়া সত্যই বড় বিপদে পড়িয়াছি। এ বিপদে তুমি ছাড়া কাহার শরণ লইব জানি না, তাই তোমার কাছেই ছুটিয়া আসিয়াছি।

তো সবই জান। এই বলিয়াই তিনি আবার নীরব হইলেন।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, যে ভাবেই হউক বন্ধুর এ দুরাশা দূর করিতেই হইবে। আমি তাহাকে দৃঢ় স্বরে বলিলাম পুণ্ডরীক, তুমি শেষকালে এ কোন্ পথ ধরিলে—এ পথে শান্তি তুমি কোন কালেও পাইবে না। তুমি শেষে কি নির্বোধের মত কাজ করিবে? তোমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবে? এ পথ তুমি ছাড়, মনকে সংযত কর।

দেখিলাম, আমার উপদেশের কোন ফলই ফলিল না, পুণ্ডরীক তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, দুরাশা বন্ধুর মনে এমনই বাসা বাঁধিয়াছে যে, তাহা দূর করা একেবারেই অসম্ভব। নানা দিক ভাবিয়া দেখিলাম, তুমি ভিন্ন এ বিপদে আমাকে সাহায্য করিতে পারে, এমন কেহ নাই। এখন যাহা উচিত বিবেচনা হয়, কর।

কপিঞ্জলের কথা শুনিয়া লজ্জা ও আনন্দে আমার মন ভরিয়া উঠিল। এ সময়ে আমার কি বলা উচিত তাহা ভাবিতেছি, পরিচারিকা আসিয়া বলিল, রাজকুমারি, তোমার শরীর ও মন খারাপ হইয়াছে শুনিয়া রাণী-মা তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া কপিঞ্জল বলিলেন: সূর্য্য অস্ত গিয়াছে,

আমিও আর অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা ভাল বোধ করিও এই বলিয়া আমার উত্তর না শুনিয়াই চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই মা আসিলেন, আমাকে কত কি বলিলেন, আমি কিন্তু এমনই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, কিছুই আমার কানে যায় নাই। কেবল এইটুকু জানি যে তিনি অনেকক্ষণ আমার কাছে ছিলেন।

মা চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার এখন কি করা কর্তব্য বল। আমি কিন্তু মনে প্রাণে মুনিকুমার পুণ্ডরীককে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তিনিও আমাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ পিতামাতার আদেশ এখনও লওয়া হয় নাই, ওদিকে মুনিকুমারের কষ্ট দূর করাও আমার একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। বল দেখি এখন কি করি?

আমার কেমন ভাবান্তর হইল, আমি মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িলাম। আমি একটু সুস্থ হইলে তরলিকা বলিল রাজকুমারি, তোমার ও মুনিকুমারের মঙ্গলের জন্য তোমার এখনই আমার সঙ্গে সেখানে যাওয়া উচিত।

তরলিকার সঙ্গে প্রাসাদ হইতে নামিতেছি, এমন সময় আমার ডান চোখ কাঁপিয়া উঠিল। যাওয়ার মুখেই এমন অলক্ষণ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি হইল, এমন অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছি কেন?

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। কোকিলের কলতানে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে প্রাণমন মাতাইয়া তুলিতেছে। সুগন্ধি ফুলের রেণু লইয়া বাতাস মৃদু মন্দ বহিতেছে। আমার গলায় সেই জপমালা এবং কানে সেই পারিজাত ফুলের মঞ্জরী। গাঢ় লালবর্ণের কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া পথ চলিলাম। আমরা দুইজনে কত হাস্য-পরিহাসই করিতে লাগিলাম মাত্র সরোবরের নিকট পৌঁছিয়াছি, পশ্চিম তীর হইতে অস্ফুট কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম, আসিবার সময় ডান চক্ষু কাঁপিয়াছিল বলিয়া ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, আমরা দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেদিকে ছুটিলাম।

ক্রমে বেশ শুনিতে পাইলাম, কপিঞ্জল আর্ত্তকণ্ঠে তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর সুহৃদ পুণ্ডরীকের নাম ধরিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন।

আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বুঝিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিনি বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি পাগলের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিলাম।

তখনকার কথা আমি কিছুই বলিতে পারিব না, আমার কোন জ্ঞানই তখন ছিল না। শুধু আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া রহিল তাঁহার প্রাণহীন মূর্ত্তি, লতামণ্ডপের মধ্যে এক

শিলাতলে শৈবালের শয্যায় শুইয়া আছেন, নানারকম ফুল তাঁহার শয্যার চারিপাশে ছড়ানো রহিয়াছে, এখানে-ওখানে মৃণাল ও কদলীর পাতা পড়িয়া আছে, তাঁহার কপালে তিলক, কাঁধে উত্তরীয়, গলায় আমার একাবলী হার, হাতে মৃণালের বলয়,—অপরূপ বেশে সাজিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কপিঞ্জল তাঁহার বুকে পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

আমার তখন কি হইয়াছিল বলিতে পারিব না। আমার মন পাষাণময় বলিয়াই হউক, হতভাগিনীর দীর্ঘ শোক ও চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই হউক, এই নিদারুণ ঘটনায়ও আমার প্রাণ বাহির হইল না। যাঁহাকে আমি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আর আমি হতভাগিনী তখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি, ইহা অসম্ভব স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল—মনে হইল আমিও যেন সত্য-সত্যই বাঁচিয়া নাই। অনেকক্ষণ পরে আমার মোহ ও শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। আমিও তখন উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম।

অতীতের সেই শোকাবহ কাহিনী বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা উন্মনা হইয়া উঠিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া শিলাতল হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন। চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোখে মুখে জল দিলেন, উত্তরীয়

দিয়া অনেকক্ষণ বাতাস করিলেন। ধীরে ধীরে মহাশ্বেতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রাপীড় দুঃখিত চিত্তে বলিলেন: দেবি, আমিই আপনার পুরানো শোক পুনরায় নূতন করিয়া তুলিয়াছি। ও-সকল কথার আর প্রয়োজন নাই। সত্যই এ কাহিনী শুনিয়া আমারও কষ্ট হইতেছে।

মহাশ্বেতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন: রাজকুমার, যে শোক আমি অবলীলা ক্রমে সহ্য করিয়াছি, তাহার স্মরণ করিয়া আর বিশেষ কি কষ্ট হইতে পারে। সেই ভীষণ ঘটনার পর যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল এবং যে দুরাশার বশে এখনও এই তুচ্ছ জীবন ধারণ করিতেছি, সে কথাই বলিতেছি শুনুন।

যাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সহিত মিলন হইবার আগেই এমন শোচনীয় বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। হতভাগিনীর জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমি তরলিকাকে চিতা সাজাইয়া দিতে বলিলাম। এমন সময় এক দীর্ঘকায় মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে হঠাৎ নামিয়া আসিলেন। তাহার পরিধানে শুভ্র বসন, কানে সোনার কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে কেয়ূর। তিনি দৃঢ় বাহু দিয়া স্বামীর মৃতদেহ উঠাইয়া লইলেন।

আমাকে বলিলেন: মহাশ্বেতা, তুমি প্রাণত্যাগ করিও না, পুণ্ডরীকের সহিত তোমার আবার মিলন হইবে। এই বলিয়া

তিনি আকাশে উঠিয়া তারার মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। কপিঞ্জল সেই মহাপুরুষের পিছনে পিছনে ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

শোকের মধ্যেও আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি তরলিকাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তরলিকা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল: আমিও তো ইহার কিছু বুঝিলাম না; আমার মনে হয় ঐ মহাপুরুষ মানুষ নহেন; যাহা বলিয়া গেলেন, তাহাও মিথ্যা হইবে না। কাজেই তোমাকে বাঁচিতেই হইবে।

আমি দুরাশার বশে প্রাণ বিসর্জ্জনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম। আশার কি অসীম ক্ষমতা। আশার বশেই আমিও ঐ জনশূন্য সরোবরের তীরে অমন একটি কালরাত্রি যাপন করিতে পারিয়াছি।

ভোরে উঠিয়া সরোবরে স্নান করিলাম। সংসার আমার কাছে অসার বলিয়া মনে হইল। আমি তখন হইতে তাঁহার কমণ্ডলু ও জপের মালা লইয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলাম এবং অবিচলিত ভক্তির সহিত অনাথের নাথ বিশ্বনাথের শরণ লইলাম। সংসারের সুখভোগ, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুদের সাহায্য—সকলই সেদিন হইতে ত্যাগ করিলাম।

পরের দিন পিতামাতা সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আত্মীয়-

পরিজনদের সহিত এখানে আসিলেন এবং আমাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া বাড়ি ফিরিতে বার বার অনুরোধ করিলেন। শেষে হতাশ হইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত চলিয়া গেলেন। তদবধি আমি কেবল চোখের জল দিয়া স্বামীর স্মৃতি-তর্পণ করি, তাঁহার গুণরাশি জপ করি, নানা ব্রত পালন করিয়া এই পোড়ার শরীর পোষণ করি। এই গিরিগুহায় থাকি, ঐ সরোবরে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি, প্রতিদিন দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া থাকি। আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে ; আমাকে দেখিলে, আমার সহিত আলাপ করিলে মানুষের দুরদৃষ্ট হয়। এতগুলি কথা বলিয়া মহাশ্বেতা বাকলে মুখ ঢাকিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

মহাশ্বেতার মহৎ চরিত্রে চন্দ্রাপীড় পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত শুনিয়া ও পতিব্রতা ধর্ম্মের আদর্শ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন : কিন্তু আপনি অল্প সময়ের পরিচয়ে যাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া স্বামী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি এমন নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, কি জন্য নিজেকে ছোট মনে করিয়া এমন ভাবে চোখের জল ফেলিতেছেন? স্বামীর স্মৃতি অক্ষয় করিবার জন্য আপনি সমস্ত ভোগসুখ, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া তপস্বিনীর মত একমনে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছেন।

স্বামীর স্মৃতির প্রতি এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধা আর কি হইতে পারে, আর কে-ইবা দেখাইতে পারে?

মূঢ় ব্যক্তিরাই সহমরণকে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বড় উপায় মনে করে, আর মেয়েরা মোহের বশে ঐ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু সহমরণ মৃত স্বামীকে জীবন দেয় না, মুক্তিও আনিয়া দেয় না, বা স্বামীর সহিত মিলনও ঘটাইতে পারে না। লাভের মধ্যে শুধু এই হয় যে, সহমৃতা মেয়েটিকে আত্মহত্যা রূপ মহাপাপ করিয়া চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। বাঁচিয়া থাকিলে নানারূপ সৎকর্ম্ম করিয়া নিজের ও দশজনের উপকার করা যায়, শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি করিয়া নিজের ও মৃতব্যক্তির তৃপ্তি সাধন করা যায়, মরিলে কাহারই কিছু উপকার নাই। শত শত পতিপ্রাণা নারী স্বামীর মরণেও জীবিতা ছিলেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। মহাপুরুষ আপনাকে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার অনুকম্পায় আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। ধৈর্য্য ধারণ করুন, অনর্থক নিজেকে আর তিরস্কার করিবেন না।

চন্দ্রাপীড়ের কথায় মহাশ্বেতা মনে যথেষ্ট শান্তি ও শক্তি পাইলেন। মহাশ্বেতাকে শান্ত দেখিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা

করিলেন ঃ আপনার পরিচারিকা তরলিকাকে তো দেখিতেছি না, সে এখন কোথায় আছে ?

মহাশ্বেতা বলিলেন ঃ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মহিষীর নাম মদিরা। ইনিও একজন অপ্সরা। ইঁহাদেরও একটি মাত্র মেয়ে কাদম্বরী। ছেলেবেলা হইতেই কাদম্বরীর সহিত আমার খুব ভাব। আমার এই অবস্থার কথা শুনিয়া কাদম্বরী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকিব, সে পর্য্যন্ত সে বিবাহ করিবে না। গন্ধর্ব্বরাজ ও তাঁহার মহিষী কাদম্বরীর এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ক্ষীরোদ নামক এক সংবাদবাহককে পাঠাইয়া কাদম্বরীর প্রতিজ্ঞার কথা আমাকে জানাইয়াছেন। আমি ক্ষীরোদের সহিত তরলিকাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। কাদম্বরীকে বলিয়া পাঠাইয়াছি, একে, আমি জীবন থাকিতেও মরিয়া আছি, তুমি কেন আমার যন্ত্রণা আরও বাড়াও। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। তুমি যদি সত্যই আমার মঙ্গল কামনা কর, তবে এই অদ্ভুত সংকল্প ছাড়, পিতামাতার ইচ্ছামত কাজ কর।

তরলিকা কাদম্বরীর নিকট যাইবার পরক্ষণেই আপনি এখানে আসিয়াছেন।

সে রাত্রিতে মহাশ্বেতা রাজকুমারকে শিলার উপর পল্লবের

শয্যা পাতিয়া দিয়া নিজে শুইতে গেলেন। রাজকুমার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরের দিন সকাল বেলা তরলিকা কেয়ূরক নামক এক গন্ধর্ব্বের সহিত মহাশ্বেতাব আশ্রমে আসিল। মহাশ্বেতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কাদম্বরী ভাল আছে তো? আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সে সম্মত হইয়াছে তো?

তরলিকা বলিল: কাদম্বরী ভালই আছেন। আপনার কথা তাঁহাকে বলিয়াছি, তাহাতে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক কথাই বলিলেন; আপনাব এ শোকের সময় তাঁহাকে বিবাহ কবিতে অনুরোধ করায় তিনি খুবই দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি কিছুতেই তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিবেন না।

কাদম্বীব এইরূপ দৃঢ়তার কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা নিজেই তাহার নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, নিজে গিয়া কাদম্বরীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ না করিলে, সে কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে না।

এইরূপ স্থির করিয়া মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে বলিলেন: রাজকুমার, আমি একবার কাদম্ববীব নিকট যাইতেছি। হেমকূট বড় চমৎকার স্থান, চিত্ররথেব রাজধানীও খুব সুন্দর। যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে, তবে আমার সঙ্গে চলুন, একবার দেখিয়া আসিবেন।

গন্ধর্ব্বরাজের রাজধানী দেখিবার আগ্রহ চন্দ্রাপীড়েরও

বড় কম ছিল না। তিনি মহাশ্বেতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেদিনই দুইজনে গন্ধর্ব্ব-নগরে যাত্রা করিলেন।

নগরে পৌঁছিয়া, রাজভবন ছাড়িয়া গিয়া, তাঁহারা কাদম্বরীর ভবনের দরজায় আসিলেন। দৌবারিকেরা দুইজনকে অভিবাদন করিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার মহাশ্বেতার সঙ্গে বিশাল রাজপুরীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা কাদম্বরীর ঘরে আসিলেন। দেখিলেন, গন্ধর্ব্ব কুমারীরা নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া চারিদিক বেড়িয়া বসিয়াছে, এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে শুইয়া রাজকুমারী কাদম্বরী কেয়ূরকের নিকট মহাশ্বেতা ও তাহার আশ্রমে নবাগত লোকটির বৃত্তান্ত শুনিতেছেন। এক পরিচারিকা চামর লইয়া রাজকন্যাকে অনবরত বাতাস করিতেছে।

কাদম্বরীর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া চন্দ্রাপীড় মুগ্ধ হইলেন। কাদম্বরী বুঝিলেন, ইনিই মহাশ্বেতার আশ্রমে নবাগত অতিথি।

বহুকালের পর প্রিয়সখীকে পাইয়া কাদম্বরীর আনন্দ যেন আর ধরে না। মহাশ্বেতা রাজকুমারের পরিচয় দিয়া বলিলেন: ইনি ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়, দিগ্বিজয়ের জন্য আমাদের দেশে আসিয়াছেন। ইনি বন্ধুত্ব ও স্নেহের জোরে আমার মন কাড়িয়া লইয়াছেন।

তোমাব কথা ইঁহাকে বলিযাছি। আমি তো ইঁহাকে আমার পবম সুহৃদ বলিয়া মনে কবি, আশা কবি তুমিও লজ্জা ভয ছাডিযা ইঁহাকে সুহৃদেব মতই গ্রহণ কবিবে।

মহাশ্বেতার কথা শুনিযা কাদম্ববী লজ্জাবনত মুখে রাজকুমারকে একখানি সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি নিজে মহাশ্বেতাকে লইয়া পর্য্যঙ্কে বসিলেন। তিনজনে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কাদম্বরী কিন্তু কিছুতেই সহজ-ভাবে চন্দ্রাপীড়ের সহিত কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও রাজমহিষী মদিরা মহাশ্বেতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাশ্বেতা যাইবার সময় বলিয়া দিলেন, রাজকুমার যেন কাদম্বরীর প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রমোদবনের মণিমন্দিরে গিয়া বিশ্রাম করেন। রাজকুমারের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কয়েকজন বীণাবাদিকা ও গায়িকাকে সঙ্গে দিয়া কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে মণিমন্দিরে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কেয়ূরক রাজকুমারকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

চন্দ্রাপীড় চলিয়া গেলে কাদম্বরী পর্য্যঙ্কে শুইয়া কত-কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জাগিয়া থাকিয়াই যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কানে কানে বলিল: কাদম্বরী, তুমি আজ কি কুকাজই করিলে? আজ তোমার মনের এমন বিকার হইল কেন? এ তো তোমার মত মেয়ের উচিত হয় নাই? এই রাজপুত্রকে তুমি আগে কখনও দেখ নাই, ইহাকে তুমি জানও না, অথচ ইহারই হাতে তুমি মন-প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়া বসিলে? লোকে এই ব্যাপার শুনিলে কি বলিবে? তুমিই না সখীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যে-পর্য্যন্ত মহাশ্বেতা বিধবার মত থাকিয়া

কষ্ট ভোগ করিবে, ততদিন তুমি বিবাহ করিবে না? তোমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় রহিল? তোমার বাবা-মা ও সখীরা তোমার এই ব্যাপার শুনিয়া কি ভাবিবেন? মহাশ্বেতা তো তোমার মনের ভাব সকলই বুঝিয়াছে। তাহার কাছেই বা কি করিয়া আবার মুখ দেখাইবে?

পরক্ষণেই আবার কে যেন আসিয়া বলিল: কাদম্বরী, তুমি তো বেশ্ মেয়ে। রাজকুমারকে একবার মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া এখন লজ্জা পাইতেছ। তোমার স্নেহ ভালবাসা তবে সবই মিথ্যা? ঐ দেখ, রাজকুমার তোমার কপট ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন।

একথা মনে হইতেই কাদম্বরী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া মণিমন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রাজকুমার সত্য-সত্যই চলিয়া যাইতেছেন কি না।

ওদিকে রাজকুমারও মণিমন্দিরে বসিয়া বীণাবাদিনী ও গায়িকাদের গানবাদ্য শুনিতে শুনিতে কাদম্বরীর কথাই ভাবিতেছিলেন। গীতবাদ্য থামিয়া গেলে তিনি মণি-মন্দিরের উপরে উঠিয়া কাদম্বরীর প্রাসাদের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, কাদম্বরী এদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। রাজকুমারী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি জানালা হইতে সরিয়া গেলেন।

সেদিন বৈকালে তমালিকা, তরলিকা প্রভৃতি পরি-
চারিকাকে সঙ্গে লইয়া কাদম্বরীর প্রধান পরিচারিকা মদলেখা

রাজকুমারের নিকট আসিল। তাহাদের কাহারও হাতে
সুগন্ধি অঙ্গরাগ, কাহারও হাতে মালতী ফুলের মালা,

কাহারও হাতে উৎকৃষ্ট রেশমি কাপড়, আর একজনের হাতে এক ছড়া মুক্তার হার। অমন সুন্দর হার রাজকুমারও কখন দেখেন নাই।

চন্দ্রাপীড় সমাদরের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। মদলেখা নিজের হাতে রাজকুমারের গায়ে সুগন্ধি অঙ্গরাগ লেপিয়া দিল, রেশমি কাপড় তাহার হাতে দিল এবং মালতীর মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, রাজকুমার, আপনি বড় সম্মানিত অতিথি। আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া রাজা, রাণী ও রাজকুমারী কাদম্বরী যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছেন। আপনার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে এবং অহঙ্কারশূন্য সৌজন্যে বশীভূত হইয়া তাঁহারা আপনাকে পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং সরল মনে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই হারগাছি আপনাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন্।

অমৃতের জন্য সাগর মন্থনের সময় দেব ও অসুরগণ সাগরের সমস্ত রত্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল এইটিই অবশিষ্ট ছিল। এজন্য এই হারটির নাম শেষ। এই হার পাইয়াছিলেন বরুণ। বরুণ দিয়াছিলেন গন্ধর্বরাজকে, তিনি দেন কাদম্বরীকে। আপনার কণ্ঠেই এই হার ঠিক মানাইবে বলিয়া কাদম্বরী রাজা ও রাণীর ইচ্ছানুসারে ইহা আপনাকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সৌজন্যে ও মদলেখার মধুর বাক্যে তুষ্ট হইয়া বলিলেন : রাজা রাণী ও রাজকুমারীকে বলিও তাঁহাদের গুণে আমিও বশীভূত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রসাদ বলিয়া আমি প্রসন্ন চিত্তে এই হার গ্রহণ করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে সুশীতল শয্যায় শুইয়া আছেন, এমন সময় কেয়ূরক আসিয়া সংবাদ দিল, কাদম্বরী রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। একটু পরেই সখীদের লইয়া কাদম্বরী আসিলেন।

রাজকুমার যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাজকুমার বলিলেন : রাজকুমারি, আমার প্রতি আপনার অযাচিত অনুগ্রহ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, অথচ অনেক ভাবিয়াও আমার ভিতর তাহার উপযুক্ত কোন গুণ দেখিলাম না। আপনি আপনার স্বাভাবিক সৌজন্য ও উদারতা বশেই এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

কুমারের বিনয় বাক্যে কাদম্বরী লজ্জায় মুখ নোয়াইলেন। ইহার পর ভারতবর্ষ, উজ্জয়িনী নগরী ও চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু-বান্ধব, পিতামাতা ও রাজ্য বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তায় রাত্রি গভীর হইল। কেয়ূরককে রাজকুমারের নিকট থাকিতে আদেশ দিয়া কাদম্বরী নিজের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

পরের দিন সকাল বেলা চন্দ্রাপীড় কেয়ূরককে পাঠাইয়া

সংবাদ লইলেন, মন্দর প্রাসাদে যে দেব মন্দির আছে, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী তাহার আঙ্গিনায় বসিয়া আছেন। রাজকুমার তাহাদের নিকট বিদায় লইবার ইচ্ছায় কেয়ূরককে লইয়া সেখানে গেলেন, দেখিলেন, মন্দিরে তাপসীগণ বুদ্ধ, জিন, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি নানা দেবতার স্তুতিপাঠ করিতেছেন মহাশ্বেতা দর্শনার্থিনী রমণীদের অভ্যর্থনা করিতেছেন কাদম্বরী একমনে মহাভারত শুনিতেছেন।

রাজকুমার মন্দির-অঙ্গনে গিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মহাশ্বেতা কাদম্বরীকে বলিলেন : সখি, রাজকুমারের সঙ্গীরা ইঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত হইয়াছে। ইনিও যাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইনি যাইবার কথা বলিতে পারিতেছেন না। যদি প্রসন্ন মনে অনুমতি দেও, তবেই ইনি যাইতে পারেন। দূরে গেলেও তোমাদের প্রীতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

কাদম্বরী বলিলেন : সখি, তুমি তো জানই রাজকুমার যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। কাজেই আমার অনুমতি চাহিয়া ইনি আমাকে শুধুই অপরাধী করিতেছেন।

কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে তাঁহার শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কয়েকজন গন্ধর্ব্ব যুবককে আদেশ করিলেন।

চন্দ্রাপীড় হাসিমুখে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। কাদম্বরীকে বলিলেনঃ রাজকুমারি, তোমার সুহৃদ্‌গণের কথা যখন বলিবে, তখন আমাকেও তোমার একজন পরম সুহৃদ্‌ বলিয়া স্মরণ করিও।

রাজকুমার চলিয়া গেলেন। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—তিন—

পরের দিন সকাল বেলা রাজকুমার শিবিরে বসিয়া আছেন। কেয়ূরক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। চন্দ্রাপীড় তাহাকে পরম আদরে বসিতে দিয়া মহাশ্বেতা, কাদম্বরী ও কাদম্বরীর সখা ও পরিজনদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

কেয়ূরক সকলের কুশল সংবাদ বলিয়া কাদম্বরীর দেওয়া কয়েকটি উপহার রাজকুমারকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। চন্দ্রাপীড় প্রসন্ন মনে হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

কেয়ূরক বলিল মহাশ্বেতা আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন, তবু আপনার ব্যবহারে এমনই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, আপনাকে জীবনেও হয়ত ভুলিতে পারিবেন না। কাদম্বরী সর্ব্বদাই আপনার কথা চিন্তা করিতেছেন। আপনি আর একবার গন্ধর্ব্ব-নগরে গেলে সকলেই সুখী হইবে।

কেয়ূরকের মুখে সকলের আগ্রহের কথা শুনিয়া রাজকুমার গন্ধর্ব্ব-নগরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। বৈশম্পায়নের উপর শিবিরের ভার দিয়া তিনি পত্রলেখার সহিত ইন্দ্রায়ুধে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

চন্দ্রাপীড় যখন গন্ধর্ব্ব-নগরে পৌঁছিলেন, কাদম্বরী তখন প্রমোদ বনে হিমগৃহে রহিয়াছেন। তাঁহার কাছেই বসিয়া ছিলেন মহাশ্বেতা। হিমগৃহ এমন চমৎকার যে, সেখানে গেলেই শরীব একেবারে শীতল হইয়া যায়। কিন্তু সেই হিমগৃহে পদ্মপাতার বিছানায় শুইয়াও কাদম্বরী যেন যন্ত্রণা বোধ করিতেছিলেন।

চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়াই কাদম্বরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। কেয়ূরক পত্রলেখার পরিচয় দিল। পত্রলেখা বিনীত ভাবে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীকে প্রণাম করিল। কাদম্বরী পরম আদরে প্রিয় সখীর ন্যায় তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন।

নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। কাদম্বরীর বিশেষ অনুরোধে পত্রলেখাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া রাজকুমাব আবার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

শিবিরে পৌঁছিয়াই চন্দ্রাপীড় দেখিলেন, উজ্জয়িনী হইতে এক বিশেষ বার্ত্তাবহ মহারাজ তারাপীড়ের পত্র লইয়া আসিয়াছে। পিতা চন্দ্রাপীড়কে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।

পিতার পত্র পাইয়া চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনীতে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। মেঘনাদ নামক এক সেনানায়ককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন কয়রকের সঙ্গে পত্রলেখা শিবিরে ফিরিয়া আসিলে

তাহাকে লইয়া যেন সে উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া যায়। সে যেন কেয়ূবককে বলে, পিতার আদেশে আমাকে এত তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীতে ফিরিতে হইল। এজন্যই কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। তাঁহারা যেন এজন্য আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে না করেন।

শিবির তুলিয়া নিবার ভার বৈশম্পায়নের উপর দিয়া রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কয়েক জন অশ্বারোহী লইয়া উজ্জয়িনীতে চলিলেন। কয়েকদিন অনবরত পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তিনি উজ্জয়িনীতে পৌঁছিলেন।

বহুদিন পরে কুমারের আগমনে রাজধানী আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিল। তারাপীড় ও বিলাসবতী এতদিনের পর পুত্রকে কাছে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। চন্দ্রাপীড়ও পিতা-মাতার কাছে আসিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তিনি পত্রলেখার কাছে গন্ধর্ব্ব নগরীর সকল সংবাদ শুনিবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরে মেঘনাদ ও পত্রলেখা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কাছে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার কুশল সংবাদ জানিয়া লইয়া, চন্দ্রাপীড় তাহাকে কাদম্বরীর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখার কথায় বুঝিলেন, কাদম্বরী রাজকুমারকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহাকে না দেখিয়া খুবই কাতর হইয়াছেন।

পত্রলেখার কথা শুনিয়া রাজকুমার গন্ধর্ব্ব নগরে যাইবার জন্য অধীর হইলেন। অথচ পিতামাতা তাঁহাকে ছাড়েন না। চন্দ্রাপীড় কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

কয়েক দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। একদিন চন্দ্রপীড় শিপ্রা নদীর তীরে বেড়াইতেছেন, এমন সময় কেয়ূবক কয়েকজন অশ্বারোহী গন্ধর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। বাজকুমার কেয়ূরককে দেখিয়া হাতে আকাশ পাইলেন। কেয়ূরক সংবাদ দিল, রাজকুমার চলিয়া আসার পর কাদম্বরী খুবই অসুস্থা হইয়া পড়িয়াছেন। মহাশ্বেতা প্রিয়সখীর জন্য চিন্তিত হইয়া রাজপুত্রকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন।

কাদম্বরীর অবস্থা শুনিয়া চন্দ্রাপীড়ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিরূপে গন্ধর্ব্ব নগরে যাইবেন, পিতামাতাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইবেন, এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, বৈশম্পায়ন শিবিরের সৈন্যসামন্ত লইয়া উজ্জয়িনীর নিকটে দশপুরী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

রাজকুমার কেয়ূরককে বলিলেনঃ আমি বৈশম্পায়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরে গন্ধর্ব্বনগরে যাইতেছি, তুমি আগে যাইয়া সংবাদ দেও। তোমার সঙ্গে পত্রলেখাকে পাঠাইতেছি। মেঘনাদ পত্রলেখাকে সেখানে লইয়া যাইবে। পত্রলেখার

নিকট আমার সংবাদ পাইলে হয়ত মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন।

কেয়ূরক মেঘনাদ ও পত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। রাজকুমার বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় রহিলেন। কয়েক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু বৈশম্পায়ন আসিল না; তখন চন্দ্রাপীড় পিতার অনুমতি লইয়া বৈশম্পায়নকে আনিতে চলিলেন। ভাবিলেন, হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বন্ধুকে চমকাইয়া দিবেন।

কিন্তু শিবিরে পৌঁছিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে রাজপুত্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, বৈশম্পায়ন শিবিরে নাই। প্রধান সৈনিক পুরুষদের ডাকিয়া তিনি তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল: শিবির ভাঙ্গিয়া আসিবার পূর্ব্বে বৈশম্পায়ন বলিলেন, অচ্ছোদ সরোবর অতি পবিত্র তীর্থ, লোকে কত কষ্ট করিয়া এখানে আসে, আর আমরা এত কাছে আসিয়া তীর্থস্নান ও মহাদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ না করিয়া চলিয়া যাইব, ইহা উচিত নয়। তিনি আমাদের লইয়া সেই সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। সরোবরের কাছেই এক লতামণ্ডপ দেখিয়া তিনি সেখানে প্রবেশ করিলেন। লতামণ্ডপের মধ্যে একখণ্ড পাথর পড়িয়াছিল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ঐ লতামণ্ডপ ও শিলাখণ্ড দেখিয়া তিনি একেবারে উন্মনা হইয়া গেলেন। মনে হইল

উহা যেন তাঁহার অতি পরিচিত স্থান, যেন ঐ স্থানে গিয়া তাঁহার মনে বহু স্মৃতির উদয় হইল। তিনি ঐ শিলাতলে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আমরা কত ডাকিলাম, তিনি কোন উত্তর দিলেন না, একদৃষ্টে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন। বার বার অনুরোধ করাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি এখান থেকে যাইব না। তোমরা সব-কিছু লইয়া চলিয়া যাও।

আমরা তবু অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমরা কিছুই বুঝিতেছ না, কি-জানি-কেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, আমার চলিবার শক্তি নাই। কি জন্য এরূপ হইয়াছে কিছুই বুঝিতেছি না। তোমরা চলিয়া যাও, আমি এখন কিছুতেই যাইতে পারিব না।

আমরা তিন দিন পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া কত বুঝাইলাম, কিন্তু তিনি পাগলের মত সেই লতামণ্ডপের চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমাদের একান্ত অনুরোধে এ কয়দিন একবার মাত্র সামান্য ফলমূল খাইলেন। আমরা দেখিলাম, তিনি এখন ফিরিবেন না, ওখানেই থাকিবেন। কাজেই কয়েকজন সৈন্য তাঁহার কাছে রাখিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি।

বৈশম্পায়নের সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত কথা শুনিয়া চন্দ্রাপীড়

বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া বৈশম্পায়নের খোঁজে বাহির হইবেন, এবং সেই অবসরে কাদম্বরীকেও দেখিয়া আসিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে বৈশম্পায়নের কথা সেখানে আগেই প্রচার হইয়া গিয়াছে এবং রাজধানীর সকলেই দুঃখশোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রাপীড় মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়া দেখিলেন, রাজা রাণী ও রাজবাড়ীর অনেকে শুকনাস ও মনোরমাকে প্রবোধ দিবার জন্য সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। সকলেই বৈশম্পায়নের কথা আলোচনা করিয়া দুঃখ করিতেছেন। চন্দ্রাপীড় সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলকে প্রবোধ দিলেন এবং পিতামাতা, শুকনাস ও মনোরমার অনুমতি লইয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধুকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন।

ইন্দ্রায়ুধ পবনবেগে ছুটিল। কিন্তু তখন প্রবল বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় পদে পদে বাধা পাইয়া রাজকুমারের যাইতে বড় বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। তবু বহুদিন চলিয়া অনেক কষ্টে তিনি অচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রাপীড় ও তাঁহার সঙ্গীরা তন্ন তন্ন করিয়া সরোবরের তীরবর্ত্তী সমস্ত বন ও লতামণ্ডপ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও বৈশম্পায়নের দেখা পাইলেন না।

কুমারের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবু একবার

শেষ চেষ্টা করিবার জন্য মহাশ্বেতার নিকট কোন সন্ধান পান কি না জানিতে গেলেন। আশ্রমে গিয়া দেখেন, মহাশ্বেতা এক শিলাতলে বসিয়া কাঁদিতেছেন, আর

তরলিকা বিষণ্ণ মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আছে। মহাশ্বেতার এই অবস্থা দেখিয়া রাজকুমারের ভয় হইল, হয়ত অসুস্থা

কাদম্বরীর অসুখ আরো বাড়িয়াছে, নগত বা অন্য কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে। তিনি ভয়ে ভয়ে মহাশ্বেতাকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাশ্বেতা চক্ষুর জল মুছিয়া কাতব স্বরে কহিলেন: কেয়ূরকের মুখে আপনি উজ্জয়িনী গিয়াছেন শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। কাদম্বরীর সহিত আপনাব বিবাহ ঘটাইয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কবিব আশা করিয়াছিলাম। এসময় আপনি চলিয়া যাওয়ায় আমার সমস্ত আশা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

একদিন আশ্রমে বসিয়া আছি, আপনাবই সমবয়স্ক এক সুকুমার ব্রাহ্মণ-যুবক আসিলেন। তাঁহাকে বড় অন্যমনস্ক দেখা গেল, তিনি যেন কোন হারানো জিনিষের খোঁজ করিতেছেন মনে হইল। তাবপর আমার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিযা রহিলেন; শেষে আমি যেন তাঁর অতি পরিচিত এভাবে এমন কতকগুলি কথা আমাকে বলিলেন, যা আমার কাছে মোটেই ভাল মনে হইল না। পুণ্ডরীকের সেই দারুণ দুর্ঘটনার পর হইতে আমি প্রায় সকল বিষয়েই নিরুৎসুক ছিলাম। আজ ব্রাহ্মণ-কুমারের কথা শুনিয়া আমার গা জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তরলিকাকে আদেশ দিয়া ফুল তুলিতে চলিয়া গেলাম।

আর একদিন রাত্রিতে খুব গরম পড়িয়াছে। তরলিকা

বাহিরে শিলাতলে গভীর ঘুমে মগ্ন। আমিও বাহিরে শুইয়া আছি, এমন সময়ে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ-কুমার আবার আসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত আমাকে কতকগুলি অসঙ্গত কথা বলিয়া বসিলেন। আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে খুবই ভর্ৎসনা করিলাম, তারপর মহাদেবের নাম লইয়া শাপ দিলাম, সে যেন পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জানি না আমার শাপের ফলে না অন্য কোন কারণে সেই ব্রাহ্মণ-কুমার অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, ঐ ব্রাহ্মণ-কুমার আপনার পরম বন্ধু। এই বলিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া অবিরল ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন।

মহাশ্বেতার মুখে প্রিয় বন্ধুর চরম দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া চন্দ্রাপীড় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তরলিকা কোন মতে তাঁহার চেতনা শূন্য দেহ ধরিয়া ফেলিল। মহাশ্বেতা, তরলিকা ও রাজকুমারের সঙ্গীরা সকলে 'হায়, হায়' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রাপীড়ের অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্রায়ুধেরও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এদিকে কাদম্বরী সংবাদ পাইলেন, চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি আর রাজকুমারের জন্য অপেক্ষা করিলেন না, পত্রলেখাকে লইয়া ছুটিয়া আশ্রমে আসিলেন। কিন্তু আসিয়াই যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে আর

ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে কাদম্বরী পাগলিনীর মত চন্দ্রাপীড়ের পা দুইখানি মাথায় লইলেন। অমনি চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে মিলাইয়া গেল।

তখনই এক দৈববাণী শোনা গেল: মহাশ্বেতা, আমার কথায় আশ্বাস পাইয়া তুমি প্রাণ ধারণ করিতেছ। অবশ্য তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পুণ্ডরীকের শরীর তোমার স্পর্শে অবিনশ্বর হইয়া আমার কাছে রহিয়াছে। শীঘ্রই তোমার সহিত তাঁহার মিলন ঘটিবে। চন্দ্রাপীড়ের দেহও কাদম্বরীর স্পর্শে অক্ষয় হইয়াছে, শুধু একটা অভিশাপে জীবন-শূন্য হইয়াছে। এই দেহ তোমরা ছাড়িও না, পোড়াইও না। যতদিন ইহাতে জীবন ফিরিয়া না আসে, ততদিন যত্ন করিয়া রক্ষা করিও।

দৈববাণী শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল। পত্রলেখা এতক্ষণ বিলাপ করিতেছিল। এখন হঠাৎ পাগলিনীর মত উঠিয়া ইন্দ্রায়ুধের নিকট গেল এবং রক্ষকের হাত হইতে জোর করিয়া বল্গা কাড়িয়া লইয়া ইন্দ্রায়ুধের সহিত অচ্ছোদ সরোবরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পত্রলেখা ও

ইন্দ্রায়ুধ সরোবরের গভীর জলে ডুবিয়া গেল। সকলে 'এ আবার কি হইল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই এক জটাধারী তাপস-কুমার জলের ভিতর হইতে উঠিলেন। মহাশ্বেতা তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, বলিলেনঃ কপিঞ্জল, এই হতভাগিনীকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? আপনার প্রিয়সখা কোথায়?

মহাশ্বেতার কথায় সকলে অবাক হইয়া তাপস-কুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। কপিঞ্জল বলিলেনঃ আমার বন্ধুকে লইয়া যে পুরুষটি চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার পিছনে চন্দ্রলোকে চলিয়া গেলাম। তিনি সেখানে তাঁহাকে চন্দ্রকান্ত মণির পর্য্যঙ্কে শোয়াইয়া আমাকে বলিলেন যে তিনি চন্দ্র। আমার বন্ধু প্রাণত্যাগ করিবার সময় তাঁহাকে বারবার ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া অনর্থক শাপ দিয়াছিলেন। এজন্য তিনিও বন্ধুকে শাপ দিলেন যে, তাহাকেও বারবার জন্মিয়া বিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রের ক্রোধ থামিয়া গেল। তিনি তখন ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারই কিরণ হইতে অপ্সরাদের যে বংশ জন্মিয়াছে, সেই বংশেরই মেয়ে মহাশ্বেতা এই মুনিকুমারকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। তখন তাঁহার বড় অনুতাপ হইল, অথচ তখন আর কোন উপায় নাই। সেই শাপের প্রভাব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার বন্ধুর মৃতদেহ সেখানেই থাকিবে, কোনরূপ

বিকৃত হইবে না। শাপের শেষে সেই শরীরেই প্রাণের সঞ্চার হইবে। তিনি মহর্ষি শ্বেতকেতুর কাছে ইহার কোন প্রতিকার করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন

চন্দ্রদেবের কথায় আমি আকাশ-পথে শ্বেতকেতুর নিকট যাইতেছিলাম, এমন সময় এক বিষম রাগী দেবতাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতেই তিনি হঠাৎ আমাকে শাপ দিয়া বসিলেন, আমি ঘোড়ার মত লাফাইয়া তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছি বলিয়া আমি যেন ঘোড়া হইয়াই জন্মি। আমি তাঁহার কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, তখন তিনি আশ্বাস দিলেন যে, আমি ঘোড়া হইয়া জন্মিয়া যাহার বাহন হইব, তিনি মরিলে আমি স্নান করিয়া আবার আমার নিজের রূপ ফিরিয়া পাইব। আমি আবারও হাতজোড় করিয়া বলিলাম, শাপের প্রভাবে চন্দ্রদেব পৃথিবীতে জন্মিবেন, আমি যেন তাঁহারই বাহন হই। তখন সেই দেবতাটি চক্ষু বুজিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন: চন্দ্র উজ্জয়িনী নগরীতে মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র হইয়া জন্মিবেন। আমি তাঁরই বাহন হইব। আমার বন্ধু পুণ্ডরীকও শুকনাসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেজন্যই আমি ঘোড়া হইয়া চন্দ্রাপীড়ের বাহন হইলাম, আমিই চন্দ্রাপীড়কে এখানে আনিলাম। যিনি তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া তোমারই শাপে বিনষ্ট হইলেন, তিনিই আমার বন্ধু পুণ্ডরীক; শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়নের রূপে এখানে তোমারই সন্ধানে

আসিয়াছিলেন। আজ আমার শাপ শেষ হইয়াছে, আমি নিজেব দেহ ফিবিয়া পাইয়াছি।

কপিঞ্জলের কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: জন্মান্তরেও স্বামী আমাকে ভুলিতে না-পারিয়া আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিলেন, আর আমি হতভাগিনী নৃশংসা বাক্ষসীব মত তাঁহার মবণেব কারণ হইলাম।

কপিঞ্জল তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: অভিশাপেব জন্যই এসব ব্যাপাব ঘটিয়াছে, তোমাব দোষ কি? তপস্যার অসাধ্য কিছু নাই। তপস্যা কবিয়াই পার্ব্বতী শিবকে পাইয়াছিলেন, সাবিত্রী মবা স্বামীকে জীয়াইযাছিলেন, তুমিও পুণ্ডরীককে পাইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মহাশ্বেতা তাঁহার প্রবোধ বাক্যে শান্ত হইলেন।

কাদম্বরী বিষাদ-মাখা মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন: ইন্দ্রায়ুধেব সহিত পত্রলেখাও তো জলে ডুবিয়াছিল? তাঁহার কি হইল?

কপিঞ্জল বলিলেন: পত্রলেখাব কথা আমি জানি না। চন্দ্রের অবতাব চন্দ্রাপীড় অথবা পুণ্ডরীকেব অবতার বৈশম্পায়নেরই বা কি হইয়াছে, সেকথাও বলিতে পাবি না। এ-সব কথা জানিবার জন্য আমি এখনই ত্রিকালদর্শী মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট যাইতেছি। এই বলিযা তিনি আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদিকে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী এবং তাঁহাদের পরিজনেরা কপিঞ্জলের কথায় বিস্মিত হইয়া শোক দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের জীবন-লাভ না করা পর্য্যন্ত সকলকে সেখানেই থাকিতে হইবে বলিয়া বাসস্থান স্থির করিয়া লইলেন। দুইজনেরই সমান দুঃখ, সমান দুর্ভাগ্য বলিয়া মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর সখিত্ব যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল।

কাদম্বরী সেই নিবিড় বনে পরম যত্নে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়া প্রতিদিন স্বামীর পাদপদ্ম পূজা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন এইরূপ চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ একটুও বিকৃত হইল না।

কাদম্বরী ইতিমধ্যে সমস্ত ঘটনা বলিয়া পিতামাতাকে নিশ্চিন্ত ও শান্ত থাকিবার জন্য মদলেখা নামক সখীকে গন্ধর্ব্ব-নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা একদিন আসিয়া কাদম্বরীকে দেখিয়া গেলেন। চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত দেহ দেখিয়া দৈববাণীতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। কাদম্বরীকে নিজের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে বলিয়া এবং নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে চন্দ্রাপীড়ের ফিরিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া উজ্জয়িনী হইতে দূতেরা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া গেল।

দূতদের মুখে ঘটনা শুনিয়া মহারাজ তারাপীড, মহারাণী বিলাসবতী, মন্ত্রী শুকনাস ও মন্ত্রীর পত্নী মনোরমা শোকে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাহারা অনতিবিলম্বে অচ্ছোদ সরোবরের তীরে আসিয়া চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত মৃতদেহ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাজা ও রাণী পুত্রবধূ কাদম্বরীর চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা-রাণী, মন্ত্রী ও মনোরমা কাদম্বরী ও মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা আশ্রমের অনতিদূরে আবাস স্থাপন করিয়া পুত্রগণের জীবন প্রাপ্তির আশায় তপস্বী ও তপস্বিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা তাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিলেন।

মহর্ষি জাবালি তাঁহার কথা শেষ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সমস্ত ঘটনাই বলিলাম। যে মুনিপুত্র পুণ্ডরীক নিজের ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া মহাশ্বেতাকে ভালবাসিয়া মরিয়াছিল, তারপর শুকনাসের পুত্ররূপে জন্মিয়াও যাহার সে মোহ কাটে নাই, ফলে নিজের ভালবাসার পাত্রী মহাশ্বেতার শাপে যাহাকে পক্ষী রূপে জন্মিতে হইয়াছে, তিনি এই। এই কথা বলিয়া আঙুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মের কথা আমার মনে হইল। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার, আমি

মানুষের মত কথা বলিতে শিখিলাম। সকলের কা
অধঃপতনের কাহিনী বলিতে আমি বড়ই লজ্জা বো
লাগিলাম। আমি মহর্ষিকে বলিলাম: আপনার অসীম
কৃপায় আমার পূর্ব্ব জন্মের সকল কথাই মনে পড়িয়াছে এবং
সমস্ত সুহৃদগণের কথাই মনে হইতেছে। কিন্তু উহা স্মরণ না
হওয়াই ছিল ভাল। এখন তাহাদের দেখিবার জন্য আমার
মন বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ ভাবে আমার মরণের
সংবাদ শুনিয়া আমার যে প্রাণপ্রিয় বন্ধু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন,
সেই চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল
হইয়াছে। তিনি কোথায় জন্মিয়াছেন আমাকে বলিয়া দিন।
আমি পক্ষী হইয়াছি, তবু তাঁহার কাছে থাকিলে খুব শান্তি
পাইব।

মহর্ষি স্নেহমিশ্রিত শাসনের সুরে বলিলেন যে পথে
গিয়া তোমার এই অধঃপতন ঘটিয়াছে, আবার সেই পথেই
যাইতে চাহিতেছ। আজও তোমার পাখা উঠে নাই, আগে
তোমার যাইবার ক্ষমতা হউক, পরে বলিয়া দিব।

কথায় কথায় রাত্রি ভোর হইয়া গেল। পম্পা-সরোবরে
কলহাঁস কলরব করিয়া উঠিল। যজ্ঞের সময় হইয়াছে দেখিয়া
মহর্ষি উঠিলেন। হারীত আমাকে তাঁহার কুটীরে রাখিয়া
চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, নিজের কর্ম্মদোষে

আমার এমন অধঃপতন ঘটিয়াছে। এখন কি উপায় করি? এ দেহ রাখিয়া লাভই বা কি! বুঝিতেছি, বুদ্ধির দোষে দুঃখে দুঃখেই আমার জীবন কাটিবে। আগের জন্মে যাহারা আমার বান্ধব ছিল, তাহাদের সহিতও আমার আর দেখা হইবে না।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হারীত আসিয়া বলিলেন: মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট হইতে তোমার পূর্ব্ববন্ধু কপিঞ্জল আসিয়াছেন, বাহিরে পিতার সহিত কথা কহিতেছেন।

আমি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলাম: কই, তিনি কোথায়? আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। ইতি-মধ্যে কপিঞ্জল আমার কাছে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার কি যে আনন্দ হইল বলিতে পারি না। বলিলাম: বন্ধু, বহুদিন তোমাকে দেখি নাই, ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে আলিঙ্গন করি, কিন্তু উপায় নাই।

কপিঞ্জল তখনই আমাকে বুকে তুলিয়া লইলেন, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম: তুমি তো আমার মত অজ্ঞান নও। আমি নিজের দোষে নিজে ভুগিতেছি। তুমি বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে আমার পিতার কথা বল।

কপিঞ্জল বলিলেন: তোমার পিতা ভাল আছেন। তিনি আমাদিগের সকল কথাই জানেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য এক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাদের

যে এ দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা তিনি আগেই জানিতেন। তবু তিনি কোন প্রতীকার করেন নাই বলিয়া অনেক দুঃখ করিলেন। আমি তোমাকে দেখিবার জন্য খুব আগ্রহ দেখাইলেও, তিনি আমাকে আসিতে দেন নাই, বলিয়াছেন, তুমি শুক পাখী হইয়াছ, আমাকে চিনিতে পারিবে না। আজ সকালে আমাকে ডাকিয়া তোমার কাছে আসিতে বলিলেন, এবং যে পর্য্যন্ত না তাহার আরব্ধ ধর্ম্মকার্য্য শেষ হয় সে পর্য্যন্ত তোমাকে এই আশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন।

কপিঞ্জল স্নেহভরে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

হারীত খুব যত্নে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমি বলশালী হইলাম এবং আমার উড়িবার শক্তি হইল। একদিন আমার মনে হইল, একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই। এই ভাবিয়া আমি উত্তর দিকে উড়িয়া চলিলাম।

উড়িবার অভ্যাস ছিল না, কিছুদূর গিয়াই বড় শ্রান্ত হইলাম। এক সরোবরের কাছে কালোজামের বনে বসিয়া যথেষ্ট ফল খাইয়া ও সুশীতল জলপান করিয়া পাখার মধ্যে ঠোঁট গুজিয়া সুখে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ জাগিয়া দেখি, এক ব্যাধের জালে বদ্ধ হইয়াছি, ব্যাধটা যমকিঙ্করের মত সামনেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মানুষের মত কথা বলিতে পারিতাম, খুব কাতর স্বরে ব্যাধকে বলিলাম ঃ মাংসের লোভে আমার মত এমন ছোট পাখীকে তুমি নিশ্চয়ই আবদ্ধ কর নাই। দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেও, চলিয়া যাই।

ব্যাধ বলিল ঃ আমি ব্যাধ সত্য, কিন্তু মাংসের লোভে তোমাকে ধরি নাই। আমরা যাহার অধীন, তিনি পক্কণদেশের রাজা। রাজার মেয়ে শুনিয়াছিলেন, জাবালি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্য্য শুকপাখী আছে, যে মানুষের মত কথা বলিতে পারে। এ-কথা শুনিয়া তিনি অনেক ব্যাধকে সেই শুকপাখী ধরিবার আদেশ দিয়াছেন। আমরাও অনেক দিন ধরিয়া খোঁজ করিয়াছি, আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে ধরিয়াছি। তোমাকে নিয়া আমাদের রাজার মেয়েকে দিব, তিনি ইচ্ছা হইলে তোমাকে ছাড়িবেন, ইচ্ছা হইলে রাখিবেন। এই বলিয়া হতভাগা ব্যাধটা আমাকে পক্কণদেশে লইয়া গেল।

ব্যাধের রাজ্য, সেখানে দয়ামায়ার লেশও নাই, চারিদিকেই কেবল পশুপাখী ধরিবার আর মারিবার আয়োজন। ব্যাধ আমাকে মেয়েটির হাতে দিল। সে আমাকে কাঠের খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখিল।

সেখানে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলাম, আমার খাঁচাটা সোনার হইয়া গিয়াছে আর পক্কণদেশ যেন স্বর্গের ন্যায় মনোহর হইয়াছে। সে যে

ব্যাধের রাজা, তাহার কোন চিহ্নই নাই। এসব দেখিয়া বড় আশ্চর্য বোধ হইল। সমস্ত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব ভাবিতেছিলাম, ইহার মধ্যে আমাকে ইহারা মহারাজের নিকট লইয়া আসিল।

রাজা শূদ্রক শুকের এই কাহিনী শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল কন্যাকে ডাকাইলেন। চণ্ডাল-কন্যা রাজার নিকট আসিয়া বলিল, সব শুনিলেন মহারাজ, তুমিই চন্দ্রের অবতার জানিবে, কাদম্বরী তোমাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তোমার আশায় সবকিছু ছাড়িয়া এক মনে তোমাকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এই শুক ভালবাসায় অন্ধ হইয়া এর পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল। আমি ইহার মা, লক্ষ্মী। মহর্ষি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই পাখী আবারও পিতার আদেশ না মানে। স্বাধীন ভাবে চলিবে। ইহার যাহাতে অনুতাপ হয় এবং যাবৎ মহর্ষি তাহার আরব্ধ যজ্ঞকার্য শেষ না করেন, সে পর্যন্ত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আমাকে পৃথিবীতে আসিতে বলিলেন। সেইজন্যই আমি চণ্ডাল-রাজার ঘরে জন্ম নিয়া উহাকে বদ্ধ রাখিয়াছিলাম। আজ মহর্ষির কার্য শেষ হইয়াছে, আমারও কাজ শেষ হইয়াছে, এজন্য তোমাদের মিলন ঘটাইয়া দিলাম। এখন এই দেহ ছাড়িয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ কর। এই বলিয়া লক্ষ্মী আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর কথা শুনিবামাত্র রাজার পূর্ব্ব জন্মের সকল কথা মনে পড়িল। কাদম্বরীর জন্য তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল।

তখন বসন্তকাল। প্রকৃতি নূতন বধূর ন্যায় নানা সজ্জায় সাজিয়া শোভায় ঝলমল করিতেছে। সুগন্ধ মলয় বাতাসে, কোকিলের কুহুরবে, অলির গুঞ্জনে, ফুলের সজ্জায় সকলের মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কাদম্বরী নিজে স্নান করিয়া চন্দ্রাপীড়ের দেহ ধুইয়া মুছিয়া দিলেন, চন্দন-কুঙ্কুমে শবদেহ সাজাইল, গলায় ফুলের মালা কানে অশোকের স্তবক পরাইয়া দিলেন, তারপর জীবিত মনে করিয়া যেমনই সেই মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, অমনি চন্দ্রাপীড় বাঁচিয়া উঠিলেন।

এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া কাদম্বরী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড় তখন হাসিয়া বলিলেন: ভীরু! ভয় কি! এই তো আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি। আমার উপর যে অভিশাপ ছিল তাহা আজ শেষ হইল। এতদিন বিদিশা নগরীতে শূদ্রক নামে রাজা ছিলাম, আজ সে শরীর ছাড়িয়া আসিয়াছি। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার তপস্যাও আজ সফল হইবে। পুণ্ডরীকেরও আজ শাপমুক্তি হইল।

পুণ্ডরীকও সেখানে আসিলেন। তাহার গলায় সেই একনরী হার, বামপাশে কপিঞ্জল। মহাশ্বেতাকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য কাদম্বরী ছুটিয়া গেলেন। চন্দ্রাপীড় পুণ্ডরীককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন: বন্ধু, তোমার ভালবাসা কখনও ভুলিব না। তুমি আমার কাছে প্রিয়সখা বৈশম্পায়নই থাকিবে, কেমন কোন আপত্তি নাই তো? পুণ্ডরীক হাসিয়া চন্দ্রাপীড়কে আলিঙ্গন করিলেন।

কথাটা বাতাসের মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও হংস মহিষী মদিরা ও গৌরীর সহিত আশ্রমে আসিলেন। ওদিকে মহারাজ তারাপীড় ও রাণী বিলাসবতী শুকনাস ও মনোরমাকে লইয়া আসিলেন। মহাশ্বেতার আশ্রম উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠিল।

চন্দ্রাপীড় পুণ্ডরীককে দেখাইয়া সকলকে বলিলেন: ইনিই আমার প্রিয়সখা বৈশম্পায়ন।

পুণ্ডরীক সকলকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

কপিঞ্জল মন্ত্রী শুকনাসকে বলিলেন: মহর্ষি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি পুণ্ডরীককে লালন-পালন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুণ্ডরীক প্রকৃতপক্ষে আপনারই পুত্র। তিনি পুণ্ডরীককে আপনার ছেলে বৈশম্পায়ন বলিয়া মনে করিতে বলিয়াছেন।

শুকনাস বলিলেন ঃ মহর্ষির আদেশ গ্রহণ করিলাম সত্যই এ যে পুণ্ডরীক, একথা আমি ভাবিতেই পারি না।;

এর পর আরম্ভ হইল গন্ধর্ব্ব নগরে বিবাহের মহোৎসব সে কি আনন্দ! রাজায় রাজায় সম্বন্ধ, রাজবাড়ীর উৎসব তা-ও আবার গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে রাজকুমারীদের বিবাহ। সে যে কত বড় হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার তা তোমরা নিজেরাই কল্পনা করিয়া লইও।

একদিন কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সকলকেই ফিরিয়া পাইলাম, কিন্তু পত্রলেখাকে তো আর পাইলাম না।

চন্দ্রাপাড় বলিলেন ঃ আমি শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে আসিলে রোহিণী পত্রলেখা রূপে আমার পরিচর্য্যার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহাকে আবার চন্দ্রলোকে দেখিতে পাইবে।

মহারাজ তারাপীড় চন্দ্রাপীড়ের হাতে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনী ও হেমকূটের রাজা হইলেন, পুণ্ডরীক হইলেন তাঁহার মন্ত্রী।

চন্দ্রাপীড় প্রায়ই পুণ্ডরীকের উপর এক এক রাজ্যের ভার দিয়া কাদম্বরীর সহিত কখন উজ্জয়িনীতে, কখন হেমকূটে, কখন চন্দ্রলোকে, কখনও বা পিতার আশ্রমে পরম আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

—শেষ—